পবিত্র ঈদ-ই- মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত এ প্রবন্ধটি
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা: এপ্রিল-জুন ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন-২০০৪ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। সালাত ও সালাম মহান রাসূল, আল্লাহর হাবীব ও মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সঙ্গীদের উপর। আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মার অন্যতম উৎসবের দিন হচ্ছে পবিত্র "ঈদে মীলাদুন্নবী"। সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান অত্যন্ত জাঁকজমক, ভক্তি ও মর্যাদার সাথে আরবী বৎসরের ৩য় মাস রবিউল আউআল মাসের ১২ তারিখে এই "ঈদে মীলাদুন্নবী" বা নবীর জন্মের ঈদ পালন করেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই এই "ঈদের" উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত নন। যে সকল ব্যক্তিত্ব এই উৎসব মুসলিম উম্মার মধ্যে প্রচলন করেছিলেন তাঁদের পরিচয়ও আমাদের অধিকাংশের অজানা রয়েছে। এই নিবন্ধে আমি উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনার চেষ্টা করব।

১) ঈদে মীলাদুন্নবী: পরিচিতি:

ক) "মীলাদ" শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: জন্মসময়। এই অর্থে "মাওলিদ" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়[১]। আল্লামা ইবনে মানযূর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান "লিসানুল আরবে" লিখছেন: "ميلاد الرجل: اسم الوقت الذي ولد فيه" অর্থাৎ: "লোকটির মীলাদ: যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম।"[২] স্বভাবত:ই মুসলমানেরা "মীলাদ" বা "মীলাদুন্নবী" বলতে শুধমাত্র নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বোঝান না। বরং তাঁরা "মীলাদুন্নবী" বলতে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করাকেই বোঝান। আমরা এই আলোচনাই "মীলাদ" বা "ঈদে মীলাদুন্নবী" বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম উদযাপন বুঝাব। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোন আনন্দ প্রকাশ, তা তাঁর জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে অন্য কোন দিনেই হোক যে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম পালন করাকে আমরা "মীলাদ" বলে বোঝব। শুধুমাত্র তাঁর জীবনী পাঠ, বা জীবনী আলোচনা, তাঁর বাণী তাঁর শরীয়ত বা তাঁর হাদীস আলোচনা, তাঁর আকৃতি বা প্রকৃতি আলোচনা করা, তাঁর উপর একাকী বা সম্মিলিত ভাবে দরুদ পাঠ করা বা সালাম পাঠ করা মূলত: মুসলিম সমাজে মীলাদ বলে গণ্য নয়। জন্ম উদযাপন বা পালন বা জন্ম উপলক্ষে কিছ অনুষ্ঠান করাই মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী। আমরা এই মীলাদ উদযাপনের ঐতিহাসিক দিকগুলো আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

খ) "মীলাদ" বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন:

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, তাই প্রথমেই আমরা তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। স্বভাবত:ই আমরা যে কোন ইসলামী আলোচনা পবিত্র কুরআন করীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলোকে শুরু করি। পবিত্র কুরআন করীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের "মীলাদ" অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন করীমে পূর্ববতী কোন কোন নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনভাবে কোন দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয় নি। অনুরূপভাবে "মীলাদ" পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদযাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোন নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয় নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার মাধ্যমে এর আত্মিক প্রেরণার ধারাবাহিকতা ব্যহত করা হয় নি। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত: হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক ও আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করব:

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন:

হাদীস বলতে আমারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম, অনুমোদন বা তাঁর সম্পর্কে কোন বর্ণনা বুঝি। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহাবীগণের কথা, কর্ম বা অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে।[৩] হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও তাঁর সাহাবাগণের মতামত সনদ বা বর্ণনাসূত্র সহ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে "সেহাহ সেত্তা" নামে প্রসিদ্ধ ৬টি অতি প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ সকল হাদীসগ্রন্থের সংকলিত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার, জন্মদিন ও জন্মতারিখ সম্মন্ধে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

১) জন্মবার:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

"عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ".

---

[1] ড: ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর) ২/১০৫৬।

[2] ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারু সাদের) ৩/৪৬৮।

[3] আব্দুল হাই লাখনাবী, যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই, দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) ৩১-৩৪ পৃ।

www.assunnahtrust.com

হযরত আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা:) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন: "এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়ত পেয়েছি।"[৪] ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ"

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন: " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়ত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং সোমবারেই তিনি হজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।"[৫] সোমবারের রোজা সম্পর্কে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ قَالَ: فَقَالَ: "إِنَّ الأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ أَوْ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلا الْمُتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخِّرْهُمَا" رواه أحمد، وفي لفظ الترمذي: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন: রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে মানুষের কর্ম আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, অত:পর আল্লাহ সকল মুসলিম বা সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র পরস্পরে রাগারাগি করে সম্পর্কছিন্নকারীদেরকে ক্ষমা করেন না, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন: এদেরকে পিছিয়ে দাও।"[৬] তিরমিযীর বর্ণনায়: "সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের কর্মসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়; এজন্য আমি চাই যে, আমার কর্ম এমন অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক যে আমি রোজা আছি।"[৭]

এভবে আমরা হাদীস শরীফ থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বার জানতে পারি। সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। কেউকেউ শুক্রবারের কথা বলেছেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা সহীহ হাদীসের বর্ণনার পরিপন্থি। কোন কোন তাবে তাবেয়ী এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকতেন। তারা বলতেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় নি। সম্ভবত: এ বিষয়ের হাদীসটি বা রাসূলে মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মতারিখ বিষয়ক কোন কিছু তাঁদের জানা ছিল না বলেই এই মত পোষণ করেছেন।[৮]

২) জন্ম বৎসর:

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৎসর বা জন্মের সাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلادِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. رواه الترمذي وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ".

হযরত কায়স ইবনে মাখরামা (রা:) বলেন: আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজনেই "হাতীর বছরে" জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত উসমান বিন আফফান (রা) কুবাস বিন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন: আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ ﷺ বড়? তিনি উত্তরে বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "হাতীর বছরে" জন্মগ্রহণ করেন।"[৯] হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ ছিল।[১০]

৩) জন্মমাস ও জন্ম তারিখ:

এভাবে আমরা হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৎসর ও জন্ম বার সম্পর্কে জানতে পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীসে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। একারণে পরবতী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন: আলেমগণ ও ঐতিহাসিকদের মতামত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কে যেহেতু হাদীসে রাসূলে কোন বর্ণনা আসে নি এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, তাই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ, ইবনে কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন:

---

[4] সহীহ মুসলিম (মিশর, কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তারিখবিহীন) ২/৮১৯।

[5] আহমাদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনাদ (মিসর, দারুল মায়ারিফ, ১৯৫০) ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬ (সম্পাদক আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ)

[6] আহমদ বিন হাম্বাল, আল- মুসনাদ, প্রাগুক্ত ১৬/১৫৫, নং ৮৩৪৩। অহমদ শাকির সনদ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, সনদটি সহীহ।

[7] তিরমিযী, আবু ইসা মুহাম্মাদ, আল-জামিয়, আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তরিখ বিহীন) ৩/১২২, নং ৭৪৭। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

[8] ইবনে রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা আল বায, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮হি: ১৯৯৭ খৃ) ১/১৪৭।

[9] তিরমিযী, আল-জামিয়, প্রাগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

[10] আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩) ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২) ১০৯-১১০ পৃ।

www.assunnahtrust.com

১) কারো মতে তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায় নি, এবং তা জানা সম্ভব নয় । তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না । এ বিষয়ে কোন আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন ।

২) কারো কারো মতে তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন ।

৩) অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন ।

৪) কারো মতে তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন । দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ বিন আব্দুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০হিঃ) এই মতটি গ্রহণ করেছেন ।

৫) অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউআল মাসের ৮ তারিখ । আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন । এই মতটি দুইজন সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস ও জুবাইর বিন মুতয়িম (রাঃ) থেকে বর্ণিত । অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন । প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (১২৫হিঃ) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম (১০০হিঃ) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন । কাসতালানী বলেন: "মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী হযরত জুবাইর বিন মুতয়িম থেকে গ্রহণ করেছেন । স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬হিঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮হিঃ) এই মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন । স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ: ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হিঃ) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন । মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ হিঃ) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত "আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর" গ্রন্থে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন ।

৬) অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১০ই রবিউল আউয়াল । এই মতটি হযরত ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকের (১১৪হিঃ) থেকে বর্ণিত । দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির বিন শারাহিল আশ শাবী (১০৪হিঃ) থেকেও এই মতটি বর্ণিত । ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন উমর আল-ওয়াকেদী (২০৭হিঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন । ইবনে সা'দ তার বিখ্যাত "আত-তাবাকাতুল কুবরা"-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ ।[১১]

৭) কারো মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল । এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (১৫১হিঃ) গ্রহণ করেছেন । তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন ।"[১২] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনে ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত: সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোন সনদ উল্লেখ করেন নি । কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানান নি বা সনদ সহ প্রথম শতাব্দীর কোন সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেন নি । এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন[১৩] । তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এই মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী হযরত জাবির ও হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই মতটি বর্ণিত ।

৮) অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল ।

৯) অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ শে রবিউল আউয়াল ।

১০) অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন ।

১১) অন্য মতে তিনি রজব জন্মগ্রহণ করেছেন । ।

১২) অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন । ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনে বাক্কার (২৫৬ হিঃ) থেকে এই মতটি বর্ণিত । তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুয়ত পেয়েছেন । তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নবুয়ত পেয়েছেন । তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে । এছাড়া বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের পবিত্র দিনগুলিতে মাতৃগর্ভে আসেন । সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত । এ মতের সপক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে একটি বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ণনাটি সহীহ নয় বলে আল্লামা কাসতালানী উল্লেখ করেছেন ।[১৪]

২) ঈদে মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস পালন বা উদযাপন:

ক) পূর্বকথা:

উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলে আকরাম ﷺ জন্মবার, জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি । তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলির আলেম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা

---

[11] ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়েত তুরাসিল আরাবী) ১/৪৭ ।

[12] ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮)১/১৮৩

[13] মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯ পৃ ।

[14] ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/২৪৫-২৪৮, ইবনে রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ, প্রাগুক্ত ১/১৫০ ।

www.assunnahtrust.com

উদযাপন করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে এধরণের মতবিরোধের কোন সুযোগ থাকত না। মুহাদ্দিস, ফুকিহ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এই অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করছে।

আমরা জানি যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে "ঈদে মীলাদুন্নবী" পালনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলিতে "ঈদে মীলাদুন্নবী" বা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন করা বা উদযাপন করার কোন প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে হাজর আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২হি: ১৪৪৯খ্রী:) লিখেছেন: "মাওলিদ পালন মূলত: বেদাত। ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনদের কোন একজনও এই কাজ করেন নি।"[১৫]

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত মুদাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যু: ৯০২হি: ১৪৯৭খ্রী:) লিখেছেন: "ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের) কোন একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা খুজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদযাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মমাস পালন করে আসছেন। এ উপলক্ষ্যে তারা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এমাসের রাত্রে তাঁরা বিভিন্ন রকমের দান-সদকা করেন, আনন্দপ্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশী করে করেন। এ সময়ে তাঁরা তাঁর জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন।"[১৬]

লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়েদ দিলদার আলী (১৯৩৫খ্রী:) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "মীলাদের কোন আসল বা সুত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) কোন সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয় নি; বরং তাঁদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে।"[১৭]

আলেমদের এই ঐক্যমতের কারণ হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধশতাধিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটিও সহীহ বা জয়ীফ হাদীসে দেখা যায় না যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে কোন সাহাবা সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদযাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বৎসরের কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান করেছেন।

রাসূলে মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন তাঁদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকাণ্ডের মূল। তাঁরা রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁর নবী-প্রেমে চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোষাক আশাকের কথা আলোচনা করে প্রেমের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেন নি। এমনকি তাঁর জন্মমুহুর্তের ঘটনাবলী আলোচনার জন্যও তাঁরা কখনো বসেন নি বা কোন দান-সাদকা, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের পরে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল।

বস্তুত: কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন "আ'জামী" বা অনারবীয় সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের জীবনাচারণে আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পরসিয়ান ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম।

খ) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রাথমিক প্রবর্তন ও সীমিত উদযাপন:

আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগগুলোর পরে মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে? কে শুরু করলেন?? আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই এবং কিভাবে তাঁরা এই অনুষ্ঠান পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি।

ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানতে পেরেছি, দুই ঈদের বাইরে কোন দিবসকে সামাজিক ভাবে উদযাপন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্দ্যোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩খ্রী:) বাগদাদের আব্বাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ই মুহাররাম আশুরাকে শোক দিবস ও জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ গাদীর খুম দিবস উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এই

---

[15] আস-সালেহী, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ (বৈরূত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬

[16] আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২

[17] সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর), ১৫ পৃ।

www.assunnahtrust.com

দুই দিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন, তবুও তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বৎসরে এই উদযাপনে বাধা দিতে পারেন নি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এই দুই দিবস উদযাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৮]

ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাঈলী শিয়াগণ[১৯] ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯খ্রী:) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবতী ২ শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২খ্রী:) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে।[২০] এই দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাঈলী শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২ ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন পালন করতেন: ১) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন, ২) হযরত আলী (রা:)র জন্মদিন, ৩) হযরত ফাতেমা (রা:)র জন্মদিন, ৪) হযরত হাসানের (রা) জন্মদিন ও ৫) হযরত হুসাইনের (রা:) জন্মদিন। এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিন পালন করতেন এবং "মীলাদ" নামে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রীসমাস), যা মিশরের খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দপ্রকাশ, মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতেন।[২১]

গ) ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি:

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হয়। এ যুগকে আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকগণ। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ২৩২ হি: (৮৪৭খ্রী:) ৯ম আব্বাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবনতির সূচনা হয়। কারণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এসকল রাষ্টের ম্যধে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ পায়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যহত হয়। বিশেষ করে ৩৩৪ হি: (৯৪৫খ্রী:) থেকে বাগদাদে শীয়া মতাবলম্বী বনূ বুয়াইহ শাসকগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান, ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাতের অনুসরণ ব্যহত হয়। রাফেযী শিয়া মতবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত। এ সকল সংঘর্ষ মূলত: দেশের সার্বিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটাত। আভ্যন্তরীন অশান্তি ও অনৈক্য বহির্শত্রুর আগ্রাসনের কারণ হয়। এশিয়া মাইনর, আর্মেনীয়া, ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন খ্রীষ্টান শাসক সুযোগমত ইসলামী সম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আগ্রাসন চালাতে থাকেন। এছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ও উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয়। অপরদিকে সমাজের মানুষের মধ্যে বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম বিরোধী আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে।[২২]

এই যুগের বিচ্ছিন্ন ইসলামী সম্রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ ও ইসলামী সভ্যতার অনত্যম কেন্দ্র মিশরে ফাতেমী খলীফা আল-মুয়িজ্জু লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যান্য জন্মদিন পালন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের শুরু করেন। তাঁর উর্দ্ধতন পিতামহ উবাইদুল্লাহ সর্বপ্রথম মরক্কোয় নিজেকে হযরত জাফর সাদিকের প্রথম পুত্র ইসমাঈলের বংশধর বলে দাবী করেন, যদিও ঐতিহাসিকগণ প্রায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তাঁর এ দাবী মিথ্যা ছিল, তিনি মরক্কোর মানুষ। তাঁর পিতা ইহুদী ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবী করেন যে শিয় মযহাবের ইমামত ইসমাঈলের মাধ্যমে তাঁর উপর এসেছে এবং তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করেন। হিজরী ৩য় শতকের শেষে (২৯৭ হি:) এক পর্যায়ে তিনি মরক্কোয় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অন্যান্য রাফেযী শিয়াদের মতই তাঁরা সাহাবীদের অবমাননা, ও হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের ইমামতের বিশ্বাস প্রচার করতেন। তাঁর পর তার পুত্র কায়েম, এরপর কায়েমের পুত্র মনুসূর এবং মানুসূরের পরে তাঁর পুত্র আবু তামীম মায়াদ্দ বিন মানসূর আল-মুইজ্জু লি দীনিল্লাহ উপাধি ধারণ করে মরক্কোর ইসমাঈলীয় রাজ্যের শাসক হন।[২৩]

আল মুয়িজ্জ ৩১৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৪১ হিজরীতে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মরক্কোর শিয়া রাজ্যের শাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সেনাপতি জাওহারকে নির্দেশ দেন মরক্কোর বিভিন্ন অঞ্চল দখল করার জন্য। এক পর্যায়ে জাওহার ৩৫৮ হিজরীতে মিসর অধিকার করেন এবং কায়রো শহরের পত্তন করেন। তিনি সিরিয়া ও হেজাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাঁর অধীনে আনেন। ৩৬২ হিজরীতে (৯৭২খ্রী:) মুয়িজ্জ কায়রো প্রবেশ করেন এবং কায়রোকেই তাঁর রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। ৩৬৫ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শাসনামলে মিশরে শিয়া শাসকদের যে সকল উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব।

---

[18] ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত ৭/৬৪২, ৬৫৩, ৮/৩, ৯, ১১, ১৫, ১৬,. ১৭, ...

[19] আগাখানী, বুহরা, বাতেনী শিয়াদের পূর্বপূরুষ।

[20] বিস্তারিত দেখুন: মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ ইং) ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

[21] আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (মিশর, কাইরো, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়্যাহ) ৪৯০-৪৯৫ পৃ।

[22] বিস্তারিত দেখুন: ইবনে কাসীর: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, মাহমূদ শাকির, আত-তারিখ আল-ইসলামী, ৫ম ও ৬ষ্ট খণ্ড।

[23] বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (বৈরুত, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯ ইং) ১৫/১৪১-১৫৯, আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরুত, দারুল মা'রিফা, ১৯৮০) ১/১৯১-১৯৮, ওয়ামী, আল-মাউসূয়া আল-মুয়াসসারা (রিয়াদ, ওয়ামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮) ৪৫-৫২ পৃ।

www.assunnahtrust.com

তিনি একজন জ্ঞানী, দৃঢ়চেতা ও সাহসী শাসক ছিলেন। তিনি কাব্যরসিক ও কবি ছিলেন। ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী লিখেছেন: "তিনি একজন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল, দৃঢ়চেতা, রুচীশীল, সুশিক্ষিত, মর্যাদাবান ও দয়ালু শাসক ছিলেন। মোটের উপর তিনি একজন ন্যায়পরাণ শাসক ছিলেন। সাহাবীদের অবমাননা মূলক রাফেযী শিয়া আকীদা ও বিদআ'ত না থাকলে তাকে সর্বোত্তম শাসকদের মধ্যে গণ্য করা হতো।"[২৪]

আল মুয়িজ্জ এর প্রচলিত এই ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন পালন ও উদযাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ বৎসর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে এই উৎসব চালু থাকে। ৪৮৭ হিঃ (১০৯৪ খ্রীঃ) ফাতেমী খলীফা আল-মুসতানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি আল-আফযাল বিন বদর আর-জামালীর সহযোগিতায় মুস্তানসিরের ছোট ছেলে ২১ বৎসর বয়স্ক আল-মুস্তা'লী খলীফা হন। সেনাপতি আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব, ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোন কোন ফাতেমী শাসক পুনরায় এ সকল উৎসব সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এ সকল উৎসব জৌলুস হারিয়ে ফেলে।[২৫]

ঘ) ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: অনুষ্ঠান পরিচিতি:

আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দী (৮২১হি:) লিখেছেন: " রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে ফাতেমী শাসক মীলাদুন্নবী উদযাপন করতেন। তাদের নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উন্নত মানের মিষ্টান্ন তৈরী করা হত। এই মিষ্টান্ন ৩০০ পিতলের খাঞ্চায় ভরা হতো। মীলাদের রাত্রিতে এই মিষ্টান্ন সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যেমন প্রধান বিচারক, প্রধান শিয়ামত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। এ উপলক্ষে খলীফা প্রাসাদের সামনের ব্যালকনীতে বসতেন। আসরের নামাযের পরে বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সংগে আজহার মসজিদের গমন করতেন এবং সেখানে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় বসতেন। মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ সময়ে ব্যালকনির জানালা খুলে হাত নেড়ে খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ করতেন। এরপর কারীগণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করতেন। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সহচরগণ হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম জানাতেন। খিড়কী বন্ধ করা হতো এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরতেন। এভাবেই তার হযরত আলীর জন্মদিনও পালন করত...।"[২৬]

আহমদ বিন আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫হি:) এ সকল জন্মদিন উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: "এ সকল জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই বড় ও মর্যাদাময় উৎসব সময়। এ সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্মারক তৈরী করত, বিভিন্ন ধরণের খাবার, মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরী করে বিতরণ করা হতো।"[২৭]

৩) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদযাপন:

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী ৪র্থ শতাব্দী থেকেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয়। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, কায়রো এই উৎসব ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। সম্ভবত: ইসমাঈলীয় ফাতেমী শিয়াদের প্রতি সাধারণ মুসলিম সমাজের প্রকট ঘৃণার ফলেই তাদের এই উৎসব সমূহ অন্যান্য সুন্নী এলাকায় জনপ্রিয়তা পায় নি বা সামাজিক উৎসবের রূপ গ্রহণ করে নি। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০) থেকেই মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের ২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বৎসর রবিউল আউআল মাসের প্রথমাংশে বা ৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মাজলিস ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে "ঈদে মীলাদুন্নবী" পালন করতে শুরু করেন।[২৮]

তবে যিনি ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি ঈদে মীলাদুন্নবীকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাক অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের শাসক হযরত আবু সাঈদ কূকবুরী (মৃত্যু: ৬৩০হি:)। পরবতী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা তার জীবনী ও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনে তাঁর পদ্ধতি আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা যে যুগের প্রেক্ষাপটে তিনি এই উৎসবের প্রচলন করেন তা আলোচনা করব।

ক) যুগ পরিচিতি: হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতক:

৪র্থ হিজরী শতকে ইসলামী জগতের অবস্থা কি ছিল তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। পরবর্তী সময়ে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ৭ম হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কাল ছিল মুসলিম উম্মার জন্য দুর্দিন ও মুসলিম ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। এ সময়ে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বাইরের শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় বিশাল মুসলিম রাজত্বের অধিকাংশ এলাকা।

৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দী মাঝামাঝি এসে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার পাশাপাশি আরো একটি কঠিন সমস্যা মুসলিম উম্মাহর সামনে এসেছে, তা হলো বাইরের শত্রুর আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের আক্রমণ।

---

[24] যাহাবী, নুবালা , ১৫/১৬৪। আরো দেখুন: ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কূম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ) ৫/২২৪-২২৮, আল-যিরিকলী, আল-আলাম বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০) ৭/২৬৫।

[25] ইজ্জত আলী আতিয়্যা, আল-বিদয়াত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০) ৪১১ পৃ, ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল (সৌদী আরব, রিয়াদ, আর-রিয়াসা আল-আমাহ লি ইদারাতিল বুহুস, ১৯৮৫) ৬৪-৭২।

[26] আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা (মিশর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়) ৩/৪৯৮-৪৯৯।

[27] আল-মাকরীযি, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার , প্রাগুক্ত, ৪৯১ পৃ।

[28] আস-সালেহী, সীরাত শামীয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১/৩৬৩, ৩৬৫।

www.assunnahtrust.com

ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু হয় হিজরী ৫ম শতাব্দীর (খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর) শেষদিকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণা করতে থাকেন। মুসলিমগণ মূর্তিপূজা করেন, তাঁরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুজা করেন, নরমাংশ ভক্ষণ করেন, যিশুখ্রীষ্টের অবমাননা করেন ইত্যাদি কথা সারা ইউরোপে প্রচারিত হতে থাকে। পাশাপাশি মুসলমানদের স্পেন বিজয় ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিজয় ইউরোপের খ্রীষ্টান শাসকদেরকে ভীত করে তোলে। তাঁরা তাঁদের অভ্যন্তরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও জাতিগত বিভেদ ও শত্রুতা ভুলে পোপের নেতৃত্বে প্যালেষ্টাইনের পবিত্রভূমি উদ্ধারের নামে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ঐক্যবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনী নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। ৪৯১ ও ৪৯২ হিজরী সালে (১০৯৭ ও ১০৯৮ খ্রী:) প্রথম ক্রুসেড বাহিনীর দশ লক্ষাধিক নিয়মিত সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া এলাকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে হামলা করেন। এই হামলায় প্রায় ২০ সহস্রাধিক মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিহত হন। ক্রুসেড বাহিনী নির্বিচারে নারীপুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেন। তাঁরা ক্ষেতখামার ও ফসলাদিও ধ্বংস করেন। এই হামলার মাধ্যমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া-প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন রাজ্য খ্রীষ্টানরা দখল করে এবং কয়েকটি খ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[২৯]

পরবর্তী ২০০ বৎসরের ইতিহাস ইউরোপীয় খ্রীষ্টান বাহিনীর উপর্যুপরি হামলা ও মুসলিম প্রতিরোধের ইতিহাস। এ সময়ে খ্রীষ্টানগণ মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম শাসকগণ বিভিন্নভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন এবং সর্বশেষ ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষদিকে সালাহুদ্দীন আইউবী অধিকাংশ খ্রীষ্টান রাজ্যের পতন ঘটান এবং প্যালেষ্টাইন ও অধিকাংশ আরব এলাকা থেকে ক্রুসেডিয়ারদের বিতাড়িত করেন।[৩০] এরপরেও মিশর, সিরিয়া ও লেবানন এলাকায় ক্রুসেডারদের কয়েকটি ছোট ছোট খ্রীষ্টান রাজ্য রয়ে যায়। তদুপরি ইউরোপ থেকে মাঝেমাঝে ক্রুসেড বাহিনীর আগমন ও বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ অব্যহত থাকে।[৩১]

যে সময়ে মুসলিমরা দখলদার ক্রুসেড বাহিনীর কবল থেকে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলকে মুক্ত করছেন, সে সময়ে, ৭ম হিজরী শতকের (১৩শ খ্রীষ্টিয় শতকের) শুরুতে মুসলিম সম্রাজ্যের পূর্বদিক থেকে তাতারদের বর্বর হামলা শুরু হয়। চেঙ্গিশ খানের নেতৃত্বে তাতার বাহিনী সর্বপ্রথম ৬০৬ হিজরীর দিকে (১২০৯ খ্রী:) মুসলিম রাজত্বের পূর্বাঞ্চলে হামলা চালাতে শুরু করে। শীঘ্রই তারা বিভিন্ন মুসলিম জনপদে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করতে থাকে। মানব ইতিহাসের বর্বরতম হামলায় তারা এসকল জনপদের সকল প্রাণীকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। বস্তুত: তাতাররা মধ্য এশিয়া, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ মুসলিম জনপদ শাব্দিক অর্থেই বিরাণ করে দেয়। পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮হি:) বলেন: "তাতাররা এসকল জনপদে কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এ প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন, বরং প্রশ্ন করতে হবে: তার কতজনকে না মেরে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"[৩২] ৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮খ্রী:) হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করে। ৪০ দিনব্যপি গণহত্যায় তারা বাগদাদের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে।[৩৩] পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮হি:) লিখেছেন: "হালাকু মৃতদেহ গণনা করতে নির্দেশ দেয়। গণনায় মৃতদেহের সংখ্যা হয় ১৮ লক্ষের কিছু বেশী। তখন (নিহতের সংখ্যায় তৃপ্ত হয়ে) হালাকু হত্যা থামানর ও নিরাপত্তা ঘোষণার নির্দেশ দেয়।"[৩৪]

বাইরের শত্রুর পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতা এ যুগে মুসলিম সমাজগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কোন কোন আঞ্চলিক শাসক নিজের এলাকায় কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনতে পারলেও সার্বিকভাবে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে।[৩৫]

পরবতী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪হি:), যিনি নিকট থেকে এ যুগের ঘটনাবলী জেনেছেন, তাতারদের নারকীয় বর্বরতার বর্ণনা দেওয়ার একপর্যায়ে লিখেন: ৬১৭হিজরী (১২২০খ্রী:) চেঙ্গিশ খান ও তার বাহিনীর বর্বর হামলা সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে। ১ বৎসরের মধ্যে তারা প্রায় সমগ্র মুসলিম জনপদ দখল করে নেয় (বাগদাদ ও পার্শ্ববতী এলাকা বাদ ছিল)। ... তারা এ বছরে বিভিন্ন বড়বড় শহরে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষকে হত্যা করে। মোটের উপর তারা যে দেশেই প্রবেশ করেছে সেখানকার সকল সক্ষম পুরুষ ও অনেক মহিলা ও শিশুকে হত্যা করেছে। গর্ভবতী মহিলাদেরকে হত্যা করে তাদের পেট ফেড়ে গর্ভস্থ শিশুকে বের করে হত্যা করেছে। যে সকল দ্রব্য তাদের প্রয়োজন তা তারা লুটপাট করেছে। আর যা তাদের দরকার নেই তা তারা পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ঘরবাড়ী সবই তারা ধ্বংস করেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে। ... মানব সভ্যতার শুরু থেকে এ পর্যন্ত এত ভয়াবহ বিপর্যয় ও বিপদ কখনো মানুষ দেখেনি .. ইতিহাসে এতবড় বর্বরতার কোন বিবরণ আর পাওয়া যায় না।[৩৬]

এভাবে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড হামলা, সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে গ্রাস এমন ভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ হিজরীর (১২৩১খ্রী:) পরে আর মুসলমানেরা ইসলামের পঞ্চম রোকন হজ্জ পালন করতে পারে না। ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর লিখছেন: "৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা হজ্জ আদায় করেন। এরপরে যুদ্ধবিগ্রহ, তাতার ও ক্রুসেডিয়ারদের ভয়ে আর কেউ হজ্জে যেতে পারেন নি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"[৩৭]

---

[29] মাহমুদ শাকির, প্রাগুক্ত ৬/৩৪-৩৮, ২৫২-২৫৭।
[30] প্রাগুক্ত ৬/২৫৯-৩৫৬।
[31] বিস্তারিত দেখুন: ; যাহাবী, আল-ই'বার ফী খাবারি মান গাবার (বইরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমীয়্যা) ৩/১২৮-৩১২।
[32] যাহাবী, ,প্রাগুক্ত, ৩/১৭২।
[33] মাহমুদ শাকির, প্রাগুক্ত ৬/৩৯-৪১, ৩৪৫-৩৫৬: যাহাবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/২৭৮।
[34] যাহাবী, আল-ই'বার , প্রাগুক্ত, ৩/২৮৭।
[35] বিস্তারিত দেখুন: ; যাহাবী, আল-ই'বার , প্রাগুক্ত, ৩/১১-২৮৫।
[36] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৮/৫৯৪-৫৯৫।
[37] ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৯/১০।

www.assunnahtrust.com

ইসলামী অনুশাসনের অবহেলা, পাপ-অনাচারের প্রসার, প্রশাসনিক দূর্বলতা, জুলুম অত্যাচারের সয়লাবের কারণে মুসলমানদের মধ্যে নেমে আসে ঈমানী দূর্বলতা। তাতারভীতি তাদেরকে গ্রাস করে। আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন: "তাতারভীতি মানুষদেরকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, একজন তাতার সৈনিক একটি বাজারে প্রবেশ করে, যেখানে শতাধিক মানুষ ছিল, তাতার সৈন্যটি একজন একজন করে সকল মানুষকে হত্যা করে বাজারটি লুট করে, খুনের এই হোলি খেলার মধ্যে একজন পুরুষও ঐ তাতারটিকে বাধা দিতে আগিয়ে আসতে সাহস পায়নি।"[৩৮]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী ৬ষ্ট ও ৭ম শতকের মুসলিম সমাজে চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি বিরাজ করছিল, যা ধমীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্থবিরতা ও অবক্ষয় নিয়ে আসে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অঙ্গনে স্থবিরতা আসে। মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন খ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হন। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় তাতার ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মানুষেরা মুসলিম সম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের আচার আচরণ ও বিশ্বাস-কুসংস্কার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। সর্বপোরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসার ফলে সমাজের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ভাবে।

সবকিছুর মধ্যেও কিছু কিছু রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও তৎকালীন আলেম সমাজের চেষ্টায় ইলমের প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহ্বানের প্রচেষ্টা অব্যহত থাকে। তবে বিশাস মুসলিম সমাজের প্রয়োজনের তুলনার আলেম ও সংস্কারকদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এছাড়া সার্বিক সামাজিক অস্থিরতা, অজ্ঞানতা ও অবক্ষয়ের ফলে সমাজে আলেমদের আবেদন কমতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ধরণের ইসলাম বিরোধী কর্ম সমাজে প্রবেশ করে। সমাজের সাধারণ মানুষই নয় ধার্মিক মানুষেরাও এমন অনেক কাজ করতে থাকেন যা শরীয়ত সঙ্গত নয় এবং ইসলামের প্রথম যুগে কোন ধার্মিক মানুষের কাজ ছিল না। সূফীয়ায়ে কেরামদের মধ্যে "সামা" বা গান বাজনার প্রসারের একটি উদাহারণের মাধ্যমে এই অবস্থা ব্যাখ্যা করতে চাই, কারণ মীলাদ অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বুঝতে তা আমাদের সাহায্য করবে।

ইসলামের প্রথম যুগগুলিতে "সামা" বা শ্রবণ বলতে শুধুমাত্র কুরআন শ্রবণ ও রাসূলে আকরামের জীবনী, কর্ম ও বাণী শ্রবণকেই বোঝান হত। এগুলিই তাঁদের মনে আল্লাহ প্রেমের ও নবী-প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। কোন মুসলিম কখনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি করার জন্য গান শুনতেন না। সমাজের বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিনোদন হিসাবে গানবাজনার প্রচলন ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম জানতেন। ২/১ জন বিনোদন হিসাবে একে জায়েয বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনই এ সকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয় নি।

প্রথম যুগের সূফীয়ায়ে কেরামগণ ছিলেন পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী। তাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের জ্ঞানে পারদর্শি, অপরদিকে ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের অনুসরণে তাঁদেরই অনুকরণে আধ্যাত্মিক সাধনা ও উৎকর্ষতায় অগ্রগামী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের সূফীগণ মূলত: কুরআন, সুন্নাহ ও সাহবীগণের জীবনাদর্শের আলোকে বেশী বেশী নফল ইবাদত, পার্থিব লালসা ত্যগ, প্রবৃত্তির বিরোধিতা, নির্জনবাস ইত্যাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎসর্ষতা লাভ করতেন। তাঁরা সকলেই মূলত: কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা ও অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। ৩য় হিজরী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী, হযরত জুনাইদ বাগদাদী (২৯৮হি:) সর্বদা বলতেন: "আমাদের এই তাসাউফের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে ব্যক্তি কুরআন হিফজ করেনি, হাদীস শিক্ষা করেনি এবং ফিকহের জ্ঞান অর্জন করে নি তাকে অনুসরণ করা যাবে না।" তিনি আরো বলতেন: "আমাদের তাসাউফ হাদীসে রাসূলের (ﷺ) সাথে গ্রথিত। ...আমরা অনিয়ন্ত্রিত কথাবার্তার মাধ্যমে তাসাউফ অর্জন করিনি। বরং ক্ষুধা (বেশী বেশী রোজা পালন, অতি অল্প আহার করা), দুনিয়া ত্যগ, ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আমরা তা অর্জন করেছি।"[৩৯]

কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক অস্থিরতা, ফিকাহ, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান চর্চার অভাব, বিজাতীয় প্রভাব ইত্যাদি কারণে সূফীদের মধ্যে বিভিন্ন অনাচার প্রবেশ করে। একদিকে অস্থির সামাজিক পরিবেশে অগণিত মুর্খ বেকার মানুষ সূফী সেজে বিভিন্ন খানকায় জমায়েত হয়ে সাধারণ মানুষের দান-খয়রাত, করুণা ও ভক্তিকে পুজি করে জীবন চালাতেন। জ্ঞান বা আল্লাহ-ভীতি কিছুই এদের মধ্যে ছিল না। সাধারণ মানুষদের ধোকা দানের জন্য নানা ধরণের ছলচাতুরিও তারা করতেন। অপরদিকে অনেক আল্লাহ-ভীরু সৎ সূফীও ইসলামী সঠিক জ্ঞানের অভাবে ভালমন্দ বিচারে রুচী বা মনের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করতেন। এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি অনাচার ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

গান বাজনা এক পর্যায়ে ধার্মিক মানুষদের ধর্মকর্মের অংশ হয়ে যায়। তারা একে "সামা" বা শ্রবণ বলতেন। এই "সামা" বা সঙ্গীত ৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে সূফী সাধকদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ হয়ে যায়। সামা ব্যতিরেকে কোন সূফী খানকা বা সূফী দরবার কল্পনা করা যেত না। সাধারণ গায়কদের প্রেম, বিরহ ও মিলন মূলক গান সূফীগণ শুনতেন। এ সকল গান তাঁদের মনে আল্লাহর প্রেম, তাঁর সাথে মিলনের আকাঙ্খা ও বিরহের বেদনার আবেশ সৃষ্টি করত। তখন তাঁরা গানের তালে তালে নাচতে থাকতেন এবং অনেকেই আবেগে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলতেন। কেহ বাজনা সহ, কেহবা বাজনা ব্যতিরেকে গান গেয়ে ও নেচে নিয়মিত সামার মাজলিস করতেন। কারণ এ সকল গান গজল আল্লাহ প্রেমিক ভক্তদের মনে আল্লাহর প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। তাঁরা সামাকে আল্লাহ প্রাপ্তির ও আল্লাহ প্রেম অর্জনের অন্যতম মাধ্যম মনে করতেন।

সমাজে যখন কোন কাজ ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, বিশেষত: ধার্মিক ও ভাল মানুষদের মধ্যে, তখন অনেক আলেম এসকল

[38] ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৮/৫৯৭।
[৩৯] যাহাবী, নুবালা, ১৪/৬৬-৭০।

www.assunnahtrust.com

কর্মের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন এবং এগুলোকে জায়েয বা ইসলাম সম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। গান বাজনার ক্ষেত্রেও এই অবস্থা হয়। কোন কোন আলেম সূফীদের প্রতি সম্মান হেতু এবং হৃদয়ে গানের ফলে যে আল্লাহ প্রেমের আবেশ ও আনন্দ পাওয়া যায় তার দিকে লক্ষ্য করে এগুলোকে জায়েয বলেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইমাম গাযালী (৫০৫হিঃ)। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন" গ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে গান বাজন ও নর্তন কুর্দনকে জায়েয বা শরীয়ত সঙ্গত বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এসকল কর্ম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না। তিনি দাবী করেছেন, গান, বাজনা, গান-বাজনার মাহফিল, গানের মাহফিলে নাচা, পাগড়ী খুলে ফেলা, কাপড় ছেড়া ইত্যাদি বিদআ'তে হাসানা এবং জায়েয। শুধু তাই নয়, এ সকল কর্মকে আল্লাহর পথের পথিকদের পাথেয় বলে মনে করেছেন।[৪০]

অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের বহুল প্রচলনকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন, এ সকল যুগে যেহেতু গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি কখনই আল্লাহর পথের পথিকদের কর্ম ছিল না, বরং সমাজের পাপী অশ্লীলতায় লিপ্ত লোকেদের কর্ম ছিল, তাই সূফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে বহুল প্রচলন সত্বেও তাঁরা এগুলিকে মেনে নেন নি, বরং তা রোধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা অনুভব করতেন যে, তাঁদের কথা সাধারণ সূফীগণ মেনে নিচ্ছেন না এবং তাঁরা গান বাজনা ও নর্তন কূর্দনের জোয়ারকে থামাতে পারছেন না। হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) (মৃত্যু ৫৬১হিঃ) কথায় আমরা তা অনুভব করি। তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও সাধক। তিনি নিজে বাজনা ও নৃত্য সহ সামার বিরোধী হলেও সেই যুগের সুফী সাধকদের মধ্যে এধরণের বাজনা ও নাচসহ সামার বহুল বিস্তারের কথা স্বীকার করেছেন এবং প্রকারান্তে অবস্থার প্রেক্ষিতে তা মেনে নিয়েছেন। তিনি তার গুনিয়াতুত্ব ত্বালিবীন গ্রন্থে সেমা অনুষ্ঠান কালীন আদব শীর্ষক অধ্যায়ে লিখছেনঃ "সেমার অনুষ্ঠান চলাকালে মুর্শিদের সম্মুখে কোনরূপ অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা নৃত্যাদি করিয়া উঠা চাই না। এ সময় যদি মুরিদের প্রতি মুর্শিদের কোন খাস তাওয়াজ্জুহের ফলে তাহার ভিতরে কোন বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তাহার কারনে আত্মবিস্মৃতির ভাব সৃষ্টি হইয়া তাহার মধ্যে অঙ্গভঙ্গী কিংবা দেহ নাড়াচাড়া শুরু হইতে থাকে, এমতাবস্থায় সৃষ্ট অবস্থাকে মাফ করা যাইতে পারে..... সেমা সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা হইল, কাওয়ালী, বাজনা ও নৃত্যকে আমরা জায়েজ মনে করি না। তবে দেখা যাইতেছে, এ যুগের বহু দরবেশ নিজ নিজ খানকায় উহার আম প্রচলন শুরু করিয়াছেন। তবে এই ব্যাপক প্রচলনের কারণেই যে একটি নিষিদ্ধ জিনিস সিদ্ধ হইয়া যায় তেমন কোন কথা নয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে, বাজনা ও নৃত্যহীন আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্তুতি এবং নাত ও হামদ সূচক সেমা অত্যন্ত খালেস ও পবিত্র দিলে যদি করা হয় এবং অনুষ্ঠানে কোনরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উহা বিভিন্ন অলী-আউলিয়া কর্তৃক সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তবে সিদ্ধ কি নিষিদ্ধ যাহাই হউক না কেন, সেমার অনুষ্ঠানেও মুরীদদিগের মুর্শিদের আদব রক্ষা করা কর্তব্য। সেমার মজলিসে খোদ মুর্শিদ উপস্থিত থাকিলে মুরীদগণ কাওয়ালকে কখনও একা বলিবে না যে, তুমি তোমার এই গজল বন্ধ রাখিয়া অমুক বিষয়ের একটি গজল বল বা তোমার এই গজলটি খুবই উত্তম ইহা আর একবার বল। এইসব ব্যাপার শুধু মুর্শিদের উপরই নির্ভর করা চাই।"[৪১]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সে যুগের আলেমদের সংস্কারমূলক কাজের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারছি। তাঁরা রাষ্ট্রীয় সমর্থন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সমাজে অজ্ঞানতার প্রভাব ছিল বেশী। তা সত্বেও তাঁরা সেই যুগে ইসলামের আলোর মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন, সমাজের মানুষদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে রহমত করুন।

খ) প্রবর্তকঃ ব্যক্তি ও জীবনঃ

আমরা আগেই বলেছি যে, মিশরের শিয়া শাসকগণ প্রথম ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তন করেন। ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে মিশরের বাইরেও কোন কোন ধর্মপ্রান মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। তবে ইরবিলের শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরীর মাধ্যমেই এই উৎসবকে সুন্নী জগতে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। এজন্য বিভিন্ন সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণ তাঁকেই ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে উল্লেখ করেছেন; কারণ তিনিই প্রথম এই উৎসবকে বৃহৎ আকারে পালন করতে শুরু করেন এবং সাধারণের মধ্যে এই উৎসবের প্রচলন ঘটান। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ সালেহী শামী (মৃত্যুঃ ৯৪২হিঃ ১৫৩৬খ্রীঃ) তার প্রখ্যাত সীরাতুন্নবী গ্রন্থে- (সীরাহ শামীয়া) ঈদেমীলাদুন্নবী পালনের আহ্বান জানাতে যেয়ে আলোচনার প্রথম দিকে লিখছেনঃ "সর্বপ্রথম যে বাদশাহ এই উৎসব উদ্ভাবন করেন তিন হলেন ইরবিলের শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরী..."[৪২]

আল্লামা যাহাবী কুকবূরীর পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে লিখছেনঃ "ধার্মিক সুলতান সম্মানিত বাদশাহ মুযাফ্ফরুদ্দীন আবু সাঈদ কূকুবুরী ইবনে আলী ইবনে বাকতাকীন ইবনে মুহাম্মাদ আল-তুরকমানী"[৪৩]। তাঁরা তুকী বংশোদ্ভুত। তাঁর নামটিও তুর্কী। তুকী ভাষায় কূকুবুরী শব্দের অর্থ "নীল নেকড়ে"।[৪৪]

তাঁর পিতা আলী ইবনে বাকতাকীন ছিলেন ইরাকের ইরবিল অঞ্চলের শাসক। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। ক্রুসেড যেদ্ধদের থেকে অনেক এলাকা জয় করে তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তিনি ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[40]আবু হামিদ আল-গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪) ২/২৯২-৩৩২।
[41]আব্দুল কাদের জীলানী, গুনিয়াতুত্ব ত্বালিবীন (বাংলা অনুবাদঃ এ এন এম ইমদাদুল্লাহ, প্রকাশক বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী , ঢাকা) ২/৩৫৯।
[42]আস-সালেহী, সীরাত, প্রাগুক্ত, ১/৩৬২।
[43]যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৪।
[44]ইবনে খাল্লিকান, ওয়াইয়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, ৪/১২১।

www.assunnahtrust.com

বীরত্ব ও ধার্মিকতার এই পরিবেশে কুকুবুরী ৫৪৯ হিঃ সনে (১১৫৪ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেণ।[৪৫] তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৪ বৎসর তখন ৫৬৩ হিঃ সনে (১১৬৮ খ্রীঃ) তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।[৪৬] পিতার মৃত্যুর পরে কুকুবূরী ইরবিলের শাসনভার গ্রহণ করেন।[৪৭] তিনি অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে আতাবিক মুজাহিদ উদ্দীন কায়মায তাঁর অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত হন।[৪৮] উক্ত অভিভাবক কিছুদিনের মধ্যেই কুকুবুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং কুকুবুরীকে শাসনকার্য পরিচালনায় অযোগ্যতার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর ভাই ইউসুফকে ক্ষমতায় বসান।[৪৯] কুকুবুরী তখন ইরবিল ত্যগ করে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে গমন করেন। সেখানে তিনি আত্মবিকাশের কোন সুযোগ না পেয়ে ইরাকের মাওসিল অঞ্চলের শাসক সাইফুদ্দীন গাযী ইবনে মাউদূদের নিকট গমন করেন। তিনি কুকুবুরীকে মাউসিলের শাসনাধীন হাররান অঞ্চলের শাসক হিসাবে নিয়োগ করেন।[৫০] কিছুদিন হাররানে অবস্থান করার পরে তিনি যে যুগের প্রসিদ্ধ বীর, মিসর ও সিরিয়ার শাসক গাজী সালাহুদ্দীন আল-আইউবীর দরবাবে যোগদেন। তিনি সালাহুদ্দীনের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সালাহুদ্দীন কুকুবুরীর বীরত্বে ও কর্তব্যনিষ্ঠায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁর বোন রারীয়া খাতুনের সাথে কুকবুরীর বিবাহ দেন এবং তাকে হাররান ও রুহা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন।[৫১] ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭খ্রীঃ) হিত্তীনের যুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইউবীর মুসলিম বাহিনী সম্মিলিত খৃষ্টান ক্রুসেড বাহিনীকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করে এবং যেরুজালেম ও সমগ্র প্যালেষ্টাইন থেকে ইউরোপীয় বাহিনীর চুড়ান্ত পরাজয়ের সূচনা করে।[৫২] এই যুদ্ধে কুকুবুরী অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ সময়ে তাঁর ভাই ইরবিলের শাসক ইউসুফ ইন্তেকাল করেন। তখন সালাহুদ্দীন কুকুবুরীকে পুনরায় ইরবিলের শাসনক্ষমতা প্রদান করেন।[৫৩]

পরবতী প্রায় ৪৫ বৎসর তিনি অত্যন্ত সুনাম ও যোগ্যতার সাথে নিজের রাজ্য পরিচালনা করেন। সাথে সাথে ক্রুসেড বাহিনী ও তাতার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি জীবনের কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন নি।[৫৪] বাগদাদের খলিফাও তাকে সম্মান করতেন। কুকুবূরী তাঁর ইনতেকালের ২ বৎসর আগে ৬২৮ হিজরীতে (১২৩১খ্রীঃ) মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে গমন করেন। তিনি ইতিপূর্বে কখনো বাগদাদে আসেন নি। বাগদাদের খলিফা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। বিশাল রাজকীয় বাহিনী তাকে অভ্যর্থনা জানায়। খলিফা স্বয়ং ২বার তাকে সাক্ষাত দান করেন, যা ছিল কুকবূরীর জন্য খুব বড় ঈর্ষনীয় সম্মান। এরপর তিনি সম্মান ও মর্যাদার সাথে নিজ রাজ্য ইরবিলে ফিরে যান।[৫৫] খলিফার নিকট কুকুবূরীর মর্যাদার আরেকটি প্রমাণ হলো যে পরের বছর, ৬২৯ হিজরীতে (১২৩২খ্রীঃ) যখন তাতার বাহিনী ইরাক অভিমুখে যাত্রা করে এবং ইরাকের মুসলিম জনপদগুলো ধ্বংশ করতে এগিয়ে আসে, তখন খলিফা কুকুবূরীর স্মরণাপন্ন হন। তিনি তাঁকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। কুকবূরী তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসলে খলিফা তার নিজের বাহিনীকে তাঁর বাহিনীর সাথে যুক্ত করেন। সম্মিলিত বাহিনী এগিয়ে যেতে থাকলে তাতার বাহিনী ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়।[৫৬] প্রতি বছর তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে খ্রীস্টান ক্রুসেড বাহিনীর নিকট থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে মুক্ত করতেন। কেউকেউ বলেছেন যে, তিনি তাঁর দীঘ জীবনে ৬০,০০০ (ষাটহাজার) মুসলিম যুদ্ধবন্ধীকে মুক্ত করেছেন।[৫৭]

ইতিপূর্বে আমরা তাতারদের সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক আক্রমন ও বিভিন্ন জনপদের ধ্বংশের কথা উল্লেখ করেছি। তাতারদের হাতে বিভিন্ন মুসলিম জনপদ ধ্বংশ হলেও কুকবুবীর জীবদ্দশায় তাতাররা কখনো ইরবিলে প্রবেশ করতে পারিনি। হিজরী ৬১৭ হিজরী সালে (১২২০খ্রীঃ) তাতার বাহিনী বোখারা ও কাযবীন অঞ্চল আক্রমন করে এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এরপর তারা ইরবিল মুখে যাত্রা শুরু করে। ইরবিলের বাদশাহ কুকবুরী পার্শবর্তী কয়েকজন শাসকের সাথে একত্রিত হয়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলা করেন। তাতার বাহিনী যুদ্ধ না করে পিছিয়ে যায়।[৫৮] আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ৬২৯হিজরীতে কুকবূরীর নেতৃত্বে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী তাতার বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে।[৫৯] কুকবুরীর ইন্তেকালের ৪ বৎসর পরে ৬৩৪ হিজরীতে তাতার বাহিনী ইরবিল দখল করে এবং সেখানে নির্বিচার গণহত্যা চালায়। ইরবিল শহরকে শাব্দিক অর্থেই ধ্বংশস্তুপে পরিণত করে অগণিত সম্পদ লুট করে লাশের স্তুপ পিছনে রেখে তাতার বাহিনী ইরবিল ত্যগ করে।[৬০]

হযরত কুকবুরী অত্যন্ত ধার্মীক ছিলেন। পরবতী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ) বলেনঃ "যদিও তিনি (কুকবুরী) একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন সচেচেয়ে বেশী ধার্মিক, সবচেয়ে বেশী দানশীল, সমাজকল্যানেব্রত ও মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম। প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের জন্য তিনি যে পরিমান অর্থব্যয় করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মত উচ্চারিত

---

[45] যিরিকলী, মুহম্মদ খাইরুদ্দীন, আল-আ'লাম, প্রাগুক্ত, ৫/২২৭।
[46] যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩২৫; আল-ই'বার, প্রাগুক্ত, ৩/৪০, ২০৮পৃ।
[47] যাহাবী, আল-ই'বার , প্রাগুক্ত, ৩/২০৮পৃ।
[48] যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৫।
[49] প্রাগুক্ত।
[50] প্রাগুক্ত।
[51] প্রাগুক্ত। সালাহুদ্দীন আইউবীরা ৬ভাই ও দুই বোন ছিলেন। যাহবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/৫৪।
[52] যাহাবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/৮৫, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত, ৮/৪৭০-৪৭৩, মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, ৬/৩৩২।
[53] যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৫, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/২০৮।
[54] যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৬।
[55] ইবনে কাসীর, আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৯/১০।
[56] ইবনে কাসীর, আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৯/১৩, যাহাবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/২০২।
[57] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৯/১৮।
[58] যাহাবী, আল ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/১৭২, ইবনে কাসীর, আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৮/৫৯৭।
[59] যাহাবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/২০২।
[60] যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৩/২১৮।

www.assunnahtrust.com

হত।"[৬১] তিনি শাসন কার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন।[৬২]

যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসনের পাশাপাশি তিনি নিজ রাজ্যে এবং বিভিন্ন ইসলামী রাজ্যে মাদ্রাসা, এতিমখানা ও গণকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ছোট্ট রাজ্যে তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে ছিল ২টি উচ্চশিক্ষাগার (মাদ্রাসা), সুফি ও মুসাফিরদের জন্য ৪টি খানকা, বিধবাদের জন্য একটি পুনর্বাসনকেন্দ্র, এতিমখানা, পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন অনাথ শিশুদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনকেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদি।[৬৩] ৫৯৮ হিজরীতে তিনি ফিলিস্তিনে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদ্রাসাটির পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করেন।[৬৪]

আবু সাঈদ কুকবুরীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইয়াকুত আল-হামাবী (মৃত্যু ৬২৬হিঃ) কুকবুরীর বর্ণনা দিকে গিয়ে লিখেছেনঃ "আমীর মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবূরী এই ইরবিল শহরের উন্নয়নমূলক প্রভুত কর্ম করেন। তিনি তার সাহস, বীরত্ব ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে এ যুগের বাদশাহদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের স্থান অধিকার করেছেন। এ কারণে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা এসে তাঁর দেশে বসবাস শুরু করেছে এবং ইরবিল শহর এ যুগের অন্যতম বৃহৎ শহরে পরিণত হয়েছে। এই আমীরের চরিত্র বৈপরিত্যময়। একদিকে তিনি প্রজাদের উপর অনেক জুলুম অত্যাচার করেন, অবৈধভাবে প্রজাদের নিকট থেকে সম্পদ সংগ্রহ করেন। অপরদিকে তিনি কুরআন পাঠক ও ধার্মিক মানুষদের সাহায্য করেন, দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য তাঁর দানের হাত খুবই প্রশস্ত। কল্যাণকর্মে তিন মুক্তহস্তে ব্যয় করেন, অমুসলিমদের নিকট বন্দী মুসলিমদেরকে টাকার বিনিময়ে মুক্ত করেন...।"[৬৫]

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের অন্যতম হলেন আল্লামা ইবনে খাল্লিকান (৬৮১হিঃ) যিনি ব্যক্তিগত ভাবে কুকুবূরীর সাথে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর দরবারে সময় কাটিয়েছেন, তাকে গভীরভাবে ভালবেসেছেন। তিনি তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ "তাঁর মত জনকল্যাণমূলক কাজ আর কেউ করেছেন বলে শোন যায় নি। পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কর্মই ছিল দান করা। প্রতিদিন কাড়িকাড়ি রুটি বিতরণ করতেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মানুষকে পোষাক দান করতেন, টাকা পয়সা দিতেন। দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্থ ও অন্ধদের জন্য তিনি ৪টি খানকা তৈরী করেছিলেন। সেখানে তিনি তাদের সকল প্রয়োজন মেটানর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি তাদের কাছে আসতেন, তাদের প্রত্যেকের খোজখবর নিতেন, ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করতেন, কিছু টাকা পয়সা দিতেন এবং প্রত্যেকের সাথে হাসি মশকরা করে তাদেরকে আনন্দ দান করতেন।

তিনি বিধবাদের জন্য একটি ও এতিমদের জন্য একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য আকেটি আশ্রয়কেন্দ্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবিকা নিয়োগ করেন যারা শিশুদের দুধপান করাতো এবং দেখাশুনা করতো। তাদের সবার প্রয়োজন মেটানর জন্য পর্যাপ্ত ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি সর্বদা সেখানে যেতেন, তাদের খোজখবর নিতেন এবং তাদেরকে বেতন ভাতার অতিরিক্ত কিছু টাকাপয়সা প্রদান করতেন। হাসপাতালে রোগীদের কাছে যেতেন ও তাদের দেখাশুনা করতেন। তাঁর মেহমানখানায় সকল মুসাফিরের স্থান হতো। সেখানে তাদের দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উপরন্তু কেউ সফরের নিয়েত করলে তাকে পথখরচা দেওয় হত।

তিনি হানাফী ও শাফেয়ী মযহাবের দুইটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বদা সেখানে গমন করতেন। তিনি সেখানে খাওয়া দাওয়া ও সামা সঙ্গীতের আয়োজন করতেন। ... সামা সঙ্গীত বা ভক্তি মূলক গানই তার জীবনের একমাত্র আনন্দ ও তৃপ্তির বিষয় ছিল। তিনি নিজের রাজ্যে কোন অন্যায়-অনাচার প্রবেশ করতে দিতেন না। তিনি সূফীদের জন্য দুইটি রাবাত বা খানকা প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে বিপুল সংখ্যক স্থায়ী ও প্রিভ্রমনকারী সূফী বাস করতেন। তিনি এই দুই খানকার জন্য অনেক ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন যদ্বারা বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক সূফীদের সকল খরচপত্রের ব্যবস্থা করা হতো। কেউ খানকা ত্যাগ করে চলে যেতে চাইলে তাকে কিছু খরচখরচা প্রদান করা হতো। তিনি নিজে প্রায়শ সেখানে আসতেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সামা সঙ্গীতের আসরের আয়োজন করতেন।

তিনি প্রতি বৎসর অনেক যুদ্ধবন্দী মুক্ত করতেন, হাজীদের জন্য সাহায্য পাঠাতেন, মক্কায় হেরেম শরীফে এবাদতকারীদের জন্য পাঁচহাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পাঠাতেন। তিনি আরাফাতের মাঠে পানির ব্যবস্থা করনে।"[৬৬]

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদা ও সংসারত্যগী মনের মানুষ। তাঁর স্ত্রী, গাযী সালাহুদ্দীনের বোন রাবিয়া খাতুন বলেনঃ তাঁর গায়ের সস্তা জামাটির দাম ছিল পাঁচ দিরহাম (রৌপমূদ্রা)-এরও কম। আমি তাঁকে এ বিষয়ে রাগ করলে তিনি বলেনঃ আমি পাঁচ দিরহামের জামা গায়ে দিয়ে বাকী অর্থ দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করলে তা আমার জন্য দামী পোষাক পরে গরীবদের বঞ্চিত করার চেয়ে অনেক ভাল।[৬৭]

ব্যক্তিগত বিলাসিতা অর্থ ব্যয় না করে জনগণেরে কল্যাণে অর্থ ব্যয় করতে তিনি পছন্দ করতেন। তিনি আলেম-সূফী-মুসাফিরদের জন্য একটি মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন । যে কেউ যে কোন স্থান থেকে আসলে সেখানে স্থান পেত। বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি দান করতে পছন্দ করতেন এবং তাঁর দানের টাকা মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী স্থানে ব্যয়ের জন্য পাঠাতেন। তিনি প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসবের জন্য ৩,০০,০০০ দীনার (স্বর্ণমূদ্রা), খানকার জন্য ২,০০,০০০ দীনার, মুসাফির খানার জন্য ১,০০,০০০ দীনার, মক্কা শরীফ মদীনা শরীফ ও হেজাজের পথে পানি সরবরাহের জন্য ৩০,০০০ দীনার ব্যয় করতেন। এসব ছিল তার প্রকাশ্য দান। এছাড়াও তাঁর অনেক গোপন দান

---

[61] যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৩/২০৮।
[62] আল-যিরিকলী, আ"লাম, প্রাগুক্ত, ৫/২৩৭।
[63] যাহাবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/২০৮, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৫।
[64] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৮/৫৩৬।
[65] ইয়াকুত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৭৯) ১/১৩৮।
[66] ইবনে খাল্লিকান ৪/১১৬-১১৭, যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৫।
[67] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/১৮। যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৬।

www.assunnahtrust.com

ছিল যা কেউ জানত না।[৬৮]

কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে হযরত কুকবূরী ৬৩০ হিজরীর ৪ঠা রমজান (১৩/৬/১২৩৩ খ্রী:) ইন্তেকাল করেন।[৬৯] তাঁর স্ত্রী গাযী সালাহুদ্দীনের বোন রাবীয়া খাতুন ১৩ বৎসর পরে ৬৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় রাবিয়া খাতুনের বয়স ৮০ উপরে ছিল।[৭০] আল্লাহ তাঁদেরকে রহমত করেন এবং উত্তম পুরস্কার দান করেন।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অন্যতম কর্ম যা তাকে সমসাময়িক সকল শাসক থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং ইতিহাসে তাকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে তা হলো ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের প্রচলন। তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত দীঘ প্রায় ৪৫ বৎসরের শাসনামলের কোন বছরে প্রথম এই অনুষ্ঠান শুরু করেন তা সঠিক ভাবে জানতে পারিনি। প্রখ্যাত বাঙ্গালী আলেমে দীন, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী ৬০৪ সাল থেকে কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন।[৭১] তিনি তাঁর এই তথ্যের কোন সূত্র প্রদান করেন নি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর আগেই কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন: "৬০৪ হিজরীতে ইবনে দেহিয়া খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবিলে আসেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন কূকুবূরী অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মীলাদ উদযাপন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে বিশাল উৎসব করেন। তখন তিনি তাঁর জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন...।"[৭২]

এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে আগমনের কিছু পূর্বেই কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন, এজন্যই ইবনে দেহিয়া ইরবিলে এসে তাকে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করতে দেখতে পান। তবে উদযাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশী আগে শুরু হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ বিষয়টি ইবনে দেহিয়া আগে জানতেন না, এতে বোঝা যায় তখনো তা পার্শবর্তী দেশগুলিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, কূকুবূরী ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে বা ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হিজরী) মীলাদ পালন শুরু করেন।

গ) প্রথম মীলাদ গ্রন্থ লেখক: ব্যক্তি ও জীবন:

মীলাদ অনুষ্ঠান প্রচলন করার ক্ষেত্রে আরেক ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা না করলে সম্ভবত: আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন "মীলাদুন্নবী"র উপরে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে হাসান, ইবনে দেহিয়া আল-কালবী (৬৩৩হি:), যার গ্রন্থ পরবর্তীতে "মীলাদ" কেন্দ্রীক অসংখ্য গ্রন্থ রচনার উৎস ছিল।

ইবনে দেহিয়া ৫৪৪ হিজরীতে (১১৫০খ্রী) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩৩হিজরীতে (১২৩৫খ্রী) মিশরে ইন্তেকাল করেন। প্রায় ৯০ বৎসরের জীবনে তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ভ্রমন করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে তাঁর অবদান রাখেন। তবে লক্ষ্যনীয় যে ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হযরত কুকবুরী যেরূপ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের প্রশংসা লাভ করেছেন, ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথম পুস্তক লেখক ইবনে দেহিয়া তদরূপ সমসাময়ীক বা পরবর্তী আলেম ও লেখকদের প্রশংসা অর্জন করতে পারেন নি। বরং সকল ঐতিহাসিক ও লেখক তাঁর কর্মময় জীবনের বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর কিছু কিছু আচরণ ও কর্মের সমালোচনা করেছেন। আমি এখানে তাঁর জীবনালেখ্য ও কর্মাবলীর আলোচনা করছি।

ইবনে দেহিয়া স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে প্রখ্যাত সাহাবী দহিয়া কালবীর বংশধর বলে দাবী করতেন। তদুপরি তিনি মাতার দিক থেকে নিজেকে হযরত ইমাম হুসাইনের বংশধর বলে দাবী করতেন। তবে সমসাময়ীক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রদত্ত নসব নামাকে অবিশ্বাস্য ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন।"[৭৩]

বংশ বা নসবনামা নিয়ে যত মতবিরোধই থাক, সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ- যাদের মধ্যে অনেকে তাঁর ছাত্র ছিলেন- লিখেছেন যে, তিনি তিনি স্পেনে প্রাথমিক লেখাপড়া করেন। স্পেনের তৎকালীন প্রখ্যাত আলেমদের নিকট তিনি হাদীস, ফিকহ, আরবী ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে লেখাপড়া করেন এবং সনদ গ্রহণ করেন। তাঁর হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর ছিল এবং তিনি আরবী ভাষায় ও আবরী ব্যাকারণে পারদর্শী ছিলেন। মালেকী মযহাবের একজন অভিজ্ঞ ফিকাহবিদ ছিলেন। পরবতীতে তিনি মযহাব ত্যাগ করেন এবং মযহাব বিরোধী যাহেরী মত অবলম্বন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। হাদীস শিক্ষা ও চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। তিনি স্পেনের "দানিয়া" শহরের বিচারক (কাজী) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি বিচারকের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পান। এরপর তিনি কিছুদিন উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় অবস্থান করেন। ৫৯৫ হি: (১১৯৯খ্র:) তিনি তিউনিসিয়ায় হাদীস শেখাতেন বলে যানা যায়। এরপর তিনি হজ্জ আদায় করেন। হজ্জ পালনের পরে তিনি মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের প্রধান শহর সমূহ সফর করেন। তিনি মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইস্পাহান, ইত্যাদি সকল অঞ্চল সফর করেন। তাঁর জ্ঞানার্জনের আগ্রহ এতই প্রবল ছিল যে, এ সময়ে তিনি একজন অভিজ্ঞ আলেম হিসাবে গণ্য হওয়া সত্বেও মরোক্কো, তিউনিসিয়া, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইস্পাহান, বিভিন্ন দেশে সফর কালে এ সকল অঞ্চলে অবস্থানকারী প্রখ্যাত আলেমদের নিকট থেকে হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। পাশাপশি তিনি এসকল এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।[৭৪]

হজ্জ পরবর্তী সফরের সময়েই ৬০৪ হিজরী সালে (১২০৭খ্রী:) তিনি ইরবীল শহরে আগমন করেন। তিনি দেখতে পান যে, সেখানকার

---

[68] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/১৮, যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৬।

[69] যাহাবী, আল-ইবার ৩/২০৮, নুবালা ২২/৩৩৭, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/১৮।

[70] যাহাবী, আল-ইবার ৩/২৪৫।

[71] মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ, হাকিকতে মোহাম্মাদী ও মীলাদে আহমাদী (পার্বত্য চট্টগ্রাম, মোহাম্মদ মুশতাকুর রহমান, প্রথম সংস্করণ) ৩০১-৩০২পৃ।

[72] ইবনে খাল্লিকান ৩/৪৪৯। আরো দেখুন: ১/২১১, ৪/১১৯

[73] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৮৯, মিযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল (বৈরুত, দারুল ফিকর) ৩/১৮৬।

[74] ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান ৩/৪৪৮-৪৫০, যাহাবী, নুবালা ২২/৩৮৯-৩৯১, আল- ইবার ৩/২১৭, ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।

www.assunnahtrust.com

শাসক কুকবুরী মহা সমারোহে রবিউল আউয়াল মাসে "ঈদে মীলাদুন্নবী" উৎসব উদাপনের প্রচলন করেছেন। তখন তিনি বাদশাহ কুকবুরীর প্রেরণায় "আত-তানবীর ফী মাওলিদিল সিরাজিল মুনীর" নামে মীলাদুন্নবীর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করে কুকবুরীকে প্রদান করেন, যে গ্রন্থটি মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত প্রথম গ্রন্থ। মীলাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের জন্য কুকবুরী তাকে একহাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পুরস্কার প্রদান করেন।[৭৫]

মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন দেশ সফর শেষে তিনি মিসরে আসেন এবং সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এ সময়ে মিশরের বাদশাহ ও মুসলিম বিশ্বের প্রধান শাসক ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই বাদশাহ "আল-মালিক আল-আদিল" সাইফুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে নাজমুদ্দীন আইউব (শাসন কাল: ৫৯৭-৬১৫হি:/ ১২০০-১২১৮খ্রী:)। তিনি ইবনে দেহিয়াকে তাঁর পুত্র যুবরাজ নাসিরুদ্দীন আবুল মায়ালী মুহাম্মাদ (আল-কামিল) এর গৃহশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দান করেন। ৬১৫হিজরীতে (১২১৮খ্রী:) আল-আদিল-এর মৃত্যু হলে যুবরাজ নাসিরুদ্দীন আবুল মায়ালী মুহাম্মাদ "আল-মালিক আল-কামিল" উপাধি গ্রহণ করে মিসরের সিংহাসনে আরহন করেন। রাজত্বকাল: ৬১৫-৬৩৫হি: (১২১৮-১২৩৮খ্রী:) তাঁর রাজত্ব তাঁর শিক্ষক ইবনে দেহিয়ার জীবনে নিয়ে আসে বিপুল গৌরব। বাদশাহ কামিল তাঁর শিক্ষক ইবনে দেহিয়াকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি তাঁকে প্রভুত মর্যাদা ও সম্পত্তি দান করেন। এছাড়া তিনি কায়রোতে "দারুল হাদীস আল-কামেলীয়া" নামে একটি হাদীস শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইবনে দেহিয়াকে এর প্রথম প্রধান নিযুক্ত করেন। বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পরে তিনি বিভিন্ন কারণে বাদশাহের বিরাগভাজন হন। বাদশাহ তাঁকে চাকুরীচ্যুত করেন। বাদশাহের শাস্তির ভয়ে তিনি পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন।

বাদশাহ কামিলের বিরাগের কারণ কি ছিল? এখানে আমরা জানতে পারি ইবনে দেহিয়ার গৌরবময় জীবনের অন্য দিকটি। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ, বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞানে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সমসাময়িক আলেমগণ দুইটি কারনে তাঁর প্রতি বিরাগ ছিলেন:

১ম কারণ হলো পূর্ববতী আলেম ও ইমামগণের ব্যাপারে তাঁর অমার্জিত ব্যবহার ও কুটুক্তি। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে নাজ্জার (৬৪৩হি:) লিখছেন: "তিনি যাহেরী মযহাব অবলম্বন করতেন, (চার মাজহাবের কোন মাজহাব মানতেন না, মযহাব মানার বিরোধিতা করতেন), সালফে সালেহীনদের সম্পর্কে (সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্বযুগের আলেমদের) ও পূর্ব বর্তী ইমামদের সম্পর্কে খুব বেশী কুটুক্তি ও অবমাননাকর কথা বলতেন। বড় জ্ঞানী হওয়া সত্তেও তিনি ছিলেন অত্যন্ন অহংকারী। তাঁর কথাবার্তা ছিল নোংরা ও কুরুচীপূর্ণ। ধর্মপালনে তিনি অবহেলা করতেন। তিনি তাঁর দাড়ী কাল রঙে খেজাব করতেন।"[৭৬]

আল্লামা জিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ আল-মাকদেসী (৫৬৯-৬৪৩হি:) বলেছেন: "আমি ইস্পাহানে তাকে দেখেছি। তবে তাঁর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কারণ তাঁর অবস্থা আমার ভাল লাগেনি। তিনি ইমামদের খুবই নিন্দামন্দ করতেন।"[৭৭] আল্লামা যাহাবী লিখেছেন: "তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, আরবী ভাষা ও হাদীস শাস্ত্রে তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তবে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে জয়ীফ বা দূর্বল ছিলেন।"[৭৮] তাঁর এই স্বভাবের কারণে তিনি যখন মরক্কো ও তিউনিসিয়া অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন তখন সে দেশের আলেমগণ একত্রে তার বিরুদ্ধে, তাঁকে অগ্রহণযোগ্র ঘোষনা দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র লিখেন।[৭৯]

দ্বিতীয় বিষয় ছিল তিনি নিজের ব্যক্তি গৌরব, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে এমন কিছু দাবী করতেন যা সে যুগের আলেমগণ মিথ্যা বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর বংশ সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছি। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল গনী, ইবনে নুকতা (৬২৯হি:) লিখেছেন: "তিনি বড় জ্ঞানী ও মর্যাদার অধিকারী হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের বিষয়ে এমন অনেক বিষয় দাবী করতেন যা ছিল একেবারেই অবাস্তব। তিনি দাবী করতেন যে, সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযী তাঁর মুখস্ত রয়েছে। একজন ছাত্র পরীক্ষামূলক ভাবে সহীহ মুসলিমের কয়েকটি হাদীস, সুনানে তিরমিযীর কয়েকটি হাদীস ও কয়েকটি বানোয়াট বা মাওযু হাদীস একত্রে লিখে তাঁকে দেন। তিনি হাদীসগুলো পৃথক করতে বা কোনটি কোন কিতাবের হাদীস তা জানতে পারেন নি।"[৮০] আল্লামা যাহাবী বলেন: "তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ ও জয়ীফ বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা খুবই আপত্তিকর।"[৮১]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হি:) ঐতিহাসিক ইবনে নাজ্জার (৬৪৩হি:) থেকে বর্ণনা করেছেন: "আমরা দেখেছি, সকল মানুষ একমত ছিলেন যে, ইবনে দেহিয়া মিথ্যা কথা বলেন এবং বিভিন্ন অসত্য দাবী করেন।"[৮২]

ইবনে হাজার আসকালানী অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন: "তাঁর সমসাময়িক এক আলেম বলেন: একদিন আমি সুলতানের দরবারে ছিলাম, যেখানে ইবনে দেহিয়াও ছিলেন। সুলতান আমাকে একটি হাদীস জিজ্ঞাসা করলে আমি হাদীসটি বলি। তখন তিনি আমাকে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি তখন হাদীসটির সনদ মনে করতে পারি না এবং আমার অপারগতা জানাই। পরে আমি দরবার ত্যাগ করলে ইবনে দেহিয়া আমার সাথে আসেন এবং বলেন: যখন সুলতান আপনাকে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন যে কোন একটি বানোয়াট সনদ বলে দিলে আপনার কি ক্ষতি হতো? সুলতান ও তার দরবারের সবাই জাহেল, তারা কিছুই বুঝতে পারত না। তাতে আপনাকে 'জানি না'

---

[75] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৬, আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২, ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।
[76] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯৪-৩৯৫, আল-যিরিকলী, আল-আ'লাম ৫/৪৪।
[77] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১।
[78] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১।
[79] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১। মিযানুল ইতিদাল ৩/১৮৬।
[80] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯২। আরো দেখুন: সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান, তাবাকাতুল হুফ্ফায (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩) ৫০১ পৃ.।
[81] মিযানুল ইতিদাল ৩/১৮৮।
[82] ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ) ৪/২৯৫।

www.assunnahtrust.com

বলতে হতো না এবং উপস্থিত সভাসদদের কাছে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। উক্ত আলেম বলেন: ইবনে দেহিয়ার এই কথায় আমি বুঝতে পারলাম তিনি মিথ্যা বলতে পরোয়া করেন না।"[৮৩]

ইবনে হাজার আসকালানী অন্য একজন সমসাময়িক আলেমের উদ্ধিতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন: "ইবনে দেহিয়া যখন ইস্পাহানে আসলেন তখন আমার পিতার খানকায় আসতেন। আমার আব্বা তাকে খুবই সম্মান করতেন। একদিন তিনি আমার আব্বার কাছে একটি জায়নামাজ নিয়ে আসেন এবং জায়নামাজটি তার সামনে রেখে বলেন: এই জায়নামাজে আমি এত এত হাজার রাকাত নামায আদায় করেছি এবং আমি কা'বা শরীফের মধ্যে এই জায়নামাজে বসে কয়েকবার কুরআন করীম খতম করেছি। আমার আব্বা খুবই খুশী হয়ে জায়নামাজটি গ্রহণ করেন এবং মাথায় রাখেন ও চুমু খেতে থাকেন। তিনি এই হাদীয়া পেয়ে খুবই খুশি হন। এ দিকে কাকতালীয় ভাবে সন্ধ্যার দিকে একজন স্পাহানী স্থানীয় ব্যক্তি আমাদের কাছে আসেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন: আপনাদের খানকায় যে মরোক্কীয় আলেম আসেন তাকে দেখলাম বাজার থেকে অনেক দামে একটি খুব সুন্দর জায়নামাজ কিনলেন। তখন আমার আব্বা (একটু খটকা লাগায়) ইবনে দেহিয়ার প্রদত্ত জায়নামাজটি আনতে বলেন। জায়নামাজটি দেখে ঐ ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে এই জায়নামাজটিই কিনতে দেখেছে ইবনে দেহিয়াকে। এতে আমার আব্বা চুপ হয়ে যান এবং আমাদের মন থেকে ইবনে দেহিয়ার প্রতি সকল সম্মান চলে যায়।"[৮৪]

আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি:) লিখেছেন: "ইবনে দেহিয়া সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। বলা হয় তিনি মাগরীবের নামায কসর করার বিষয়ে একটি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলেছেন। আমার ইচ্ছা ছিল হাদীসটির সনদ দেখব, কারণ সকল মুসলিম আলেম একমত যে, মাগরীবের নামায কসর হয় না... আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাঁকে দয়া করে ক্ষমা করে দিন।"[৮৫]

ইবনে দেহিয়ার মিথ্যাচার সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রদান করেছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (৬৮১ হি:)। ইবনে দেহিয়ার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল বলে তাঁর লেখা থেকে প্রতিয়মান হয়। তাঁর লেখা মীলাদের বইটি তিনি ৬২৫ হিজরীতে কুকবুরীর দরবারে বসে পড়তে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।[৮৬] কিন্তু তিনি আশ্চার্য্য হন যে, উক্ত বইয়ের শেষে ইবনে দেহিয়া একটি বড় আরবী কসীদা লিখেছেন কুকবূরীর প্রশংসায়। তিনি দাবী করেছেন যে, কসীদাটি তিনি নিজে লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইবনে খাল্লিকান জানতে পারেন যে, কবিতাটি সিরিয়ার হালাবশহরের বাসিন্দা কবি আসআদ বিন মামাতী (মৃত্যু ৬০৬হি:) লেখা ও তাঁর কাব্য গ্রন্থে সংকলিত, তিনি উক্ত কসীদা দ্বার তৎকালীন অন্য একজন শাসকের প্রশংসা করেন।[৮৭]

এ সকল কারণে তৎকালীণ আলেমগণ বাদশাহ কামিলের নিকট ইবনে দেহিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তৎকালীন বহুল প্রচলিত উপদেশ মূলক "আশ শিহাব" গ্রন্থের উপর টীকা লিখতে অনুরোধ করেন। ইবনে দেহিয়া একটি টীকা গ্রন্থ রচনা করেন যাতে তিনি উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস ও তার সনদের উপর আলোচনা করেন। বাদশাহ তা পাঠ করেন। কিছুদিন পরে তিনি বলেন যে, আগের টীকাগুলি হারিয়ে গিয়েছে, পুনরায় একটি টীকাগ্রন্থ লিখে দিন। ইবনে দেহিয়া আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন যাতে তিনি আগের মত আলোচনা করেন। কিন্তু প্রথমবারের ও দ্বিতীয়বারের আলোচনা, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ছিল পরস্পর বিরোধী। এতে বাদশাহ অভিযোগকারী আলেমদের সাথে একমত হন যে, ইবনে দেহিয়া মন মর্জিমত কথা বলেন এবং বানোয়াট বিভিন্ন দাবী করেন। এরপর তিনি তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া তাঁর অন্য কিছু কাজেও তিনি অসন্তুষ্ট হন বলে জানা যায়।[৮৮]

কর্মময় সুদীর্ঘ প্রায় ৯০ বৎসরের জীবনে শেষে "মীলাদুন্নবী"র প্রথম গ্রন্থ লেখক হযরত আল্লামা ইবনে দাহিয়া ৬৩৩হিজরীর ১৪ই রবিউল আউআল (২৬/১১/১২৩৫খ্রী:) তিনি ইন্তেকাল করেন।[৮৯]

সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, ইবনে দেহিয়া যে যগের একজন অন্যতন আলেম ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি অনেক বই পুস্তক লিখেছেন। সমসাময়িক একজন ঐতিহাসিক তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহের প্রশংসা করে লিখেছেন: "তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন এবং অনেক সফর করেছেন। উন্নত মানের অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। সাধারণ মানুষ এবং সমাজের উচুঁ স্তরের মানুষ সবার কাছেই তিনি সম্মান পেতেন।"[৯০]

তবে নি:সন্দেহে যে গ্রন্থটি তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে তা হলো "মীলাদুন্নবী" বা রাসূলে আকরামরে জন্মবিষয়ে লেখা তার বই "আত- তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর আন-নাযির"। কারণ এটিই ছিল "মীলাদুন্নবী" বা রাসূলে আকরামরে জন্মবিষয়ে লেখা প্রথম বই। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে প্রবেশ করেন। তিনি বছর দুয়েক সেখানে বাদশাহ কূকুবূরীর রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি এই বইটি সংকলন করেন। ৬০৬ হিজরীতে তিনি এই বইটি লেখা সমাপ্ত হলে তা কূকুবূরীকে পড়ে শোনান।[৯১]

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মহান নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা তৎপরবর্তী মুসলিম সমাজের আলেমগণ ৬০০ বৎসর যাবৎ তাঁর জন্মকে কেন্দ্র করে কি একটি বইও লিখেন নি? যার ফলে এই কৃতিত্ব ইবনে

---

[83] ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান ৪/২৯৫।
[84] ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান ৪/২৯৬।
[85] ইবনে কাসীর , আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।
[86] ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ১/২১২, ৩/৪৪৯-৪৫০।
[87] ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ১/২১১-২১২, ৩/৪৫০।
[88] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯২, মিযানুল ইতিদাল ৩/১৮৭।
[89] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৮৯-৩৯৫, মিযানুল ইতিদাল ৩/১৮৯, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।
[90] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯৪।
[91] ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ১/২১২, ৩/২৯, ৪/১১৯।

www.assunnahtrust.com

দেহিয়া পেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে সেই যুগ গুলির অবস্থা বুঝতে হবে। প্রথম যুগের মুসলিম গণ, সাহাবী ও তাবেয়ী গণের সাবক্ষণিক কর্ম ও ব্যস্ততা ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে। তাঁদের সকল আবেগ, ভালবাসা ও ভক্তি দিয়ে তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও কর্ম জানতে, বুঝতে, শেখাতে ও লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাদের কর্মকাণ্ডের যে বর্ণনা হাদীস শরীফে ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাদের যুগে লিখিত ও সংকলিত যে সকল বই পুস্তকের বর্ণনা আমরা পাই বা যে সকল বই পুস্তক বর্তমান যুগ পর্যন্ত টিকে আছে তার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা মূলতঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, চরিত্র, ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি, জীবনপদ্ধতি জানতে বুঝতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর জীবনী সংকলনের দিকে যে যুগের মুসলিমেদের মনোযোগ দেখা যায় না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও তাঁর প্রবর্তিত বিধানাবলীর দিকটায় তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বা জীবনী রচনার দিকে তারা গুরুত্ব প্রদান করেন নি। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন, জন্ম তারিখ বা জন্মমাস নিয়ে কোন আলোচনাই পাওয়া যায় না। স্বভাবতঃই তাঁর জন্ম কেন্দ্রীক কোন গ্রন্থও তখন রচিত হয়নি। প্রথম তিন শতাব্দীতে রচিত হাদীস গ্রন্থ সমূহে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সংক্রান্ত যৎসামান্য কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আগে আলোচনা করেছি। এছাড়া প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে সীরাতুন্নাবী বা নবী জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হতে থাকে বলে মনে হয়। তবে এ যুগে মূলতঃ সীরাতুন্নাবীর মাগাযী বা যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক বিষয়েই বিশেষভাবে লিখা হত।[৯২] দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের উল্লেখ যোগ্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থ হল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫১হিঃ/৭৬৮খ্রীঃ), আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৮হিঃ/৮৩৪খ্রীঃ), মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (২৩০হিঃ/৮৪৫খ্রীঃ) প্রমুখের লিখা "সীরাতুন্নবী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মসংক্রান্ত কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া ৩য় হিজরী শতক থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ লিখিত সকল ইতিহাস গ্রন্থে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মসংক্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন খলীফা ইবনে খাইয়াত আল-শাব আল উসফূরী (২৪০হিঃ/৮৫৪খ্রীঃ), আহমদ ইবনে ইয়হইয়া আল বালাযুরী (২৭৯হিঃ/৮৯২খ্রীঃ), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে জরীর (৩১০হিঃ/৯২৩খ্রীঃ) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ। ৫ম হিঃ শতক থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক সংঘঠিত মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী পৃথক ভাবে সংকলিত করে "দালাইলুন নুবুওয়াত" নামে কয়েকটি গ্রন্থ লেখা হয়, যেমন আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আসফাহানী (৪৩০হিঃ/১০৩৯খ্রীঃ) ও আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল- বাইহাকী (৪৫৮হিঃ/১০৬৬খ্রীঃ) সংকলিত "দালাইলুন নুবুওয়াত" গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কালীন অলৌকিক ঘটনাবলীর কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। সর্বাবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকে নিয়ে পৃথক গ্রন্থ কেউই রচনা করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর জন্ম উদযাপন যেমন ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে মুসলিম উম্মাহর অজানা ছিল, তেমনি তাঁর জন্ম বা "মীলাদ" নিয়ে পৃথক গ্রন্থও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে কেউ রচনা করেন নি। তাই এই কৃতিত্ব পেলেন ইবনে দেহিয়া।

তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের কথা ইতিহাস থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে ইসলামী গ্রন্থাগার থেকে, কারণ ঐ ধরণের আরো অগণিত বই অন্য আরো অনেক আলেম লিখেছেন। কিন্তু মীলাদের গ্রন্থটির কথা ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক অনেক আলেম ও ঐতিহাসিক বইটি পড়তে পেরে আনন্দিদ ও উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (৬৮১হিঃ) লিখেছেনঃ "তিনি প্রখ্যাত আলেমদের ও বিখ্যাত মর্যাদাশীল মানুষদের একজন ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অধিকার ছিল। ... তাঁর লিখিত মীলাদের গ্রন্থটি ৬২৫হিজরীতে আমরা ইরবীলের বাদশা কুকবুরীর দরবারে ৬ মাজলিসে শ্রবণ করেছিলাম।"[৯৩] ৮ম হিজরী শতাব্দীর মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর (৭৭৪হিঃ) লিখেছেনঃ "মীলাদের উক্ত গ্রন্থ আমি পড়েছি এবং তা থেকে কিছু সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বিষয় আমি লিখে নিয়েছি।"[৯৪]

ঘ) ঈদে মীলাদুন্নবীঃ অনুষ্ঠান পরিচিতিঃ

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা মীলাদ প্রবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে পরিচিত হয়েছি। এখন আমরা দেখতে চাই কিভাবে তাঁরা মীলাদুন্নবী পালন করতেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খাল্লিকান কূকুবূরীরর মীলাদ অনুষ্ঠানের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেনঃ

কূকুবূরীর মীলাদুন্নবী উদযাপনের বর্ণনা দিতে গেলে ভাষা অপারগ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের মানুষেরা যখন এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা জানতে পারেন তখন পার্শবর্তী সকল এলাকা থেকে লোকজন এসে এতে অংশ নিতে থাকে। বাগদাদ, মাউসিল, জাযিরা, সিনজার, নিস্সিবীন, পারস্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক আলেম, কারী, সূফী, বক্তা, ওয়ায়েজ, কবি এসে জমায়েত হতেন। মুহররম মাস থেকেই এদের আগমন শুরু হত, রবিউল আউয়ালের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আগমন অব্যাহত থাকত। খোলা প্রান্তরে ২০টি বা তারো বেশী বিশাল বিশাল কাঠের কাঠামো (প্যাণ্ডেল) তৈরী করা হতো যার একটি তাঁর নিজের জন্য নির্ধরিত থাকত, বাকীগুলিতে তার আমীর ওমরাহ, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণের জন্য নিধারিত হতো। সফর মাসের ১ তারিখ থেকে এ সকল কাঠামোগুলিকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হতো। প্রত্যেক প্যাণ্ডেলের প্রতিটি অংশে থাকত গায়কদের দল, অভিনয়কারীদের দল এবং বিভিন্ন খেলাধুলা দেখানর দল। এ সময়ে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। সকলের একমাত্র কাজ হয়ে যেত এ সকল প্যাণ্ডেলে ঘুরে বেড়ান এবং আনন্দ উল্লাস করা। প্রতিদিন আসরের নামাজের পরে কূকুবূরী মাঠে আসতেন এবং প্রতিটি প্যাণ্ডেলে যেয়ে তাদের গান শুনতেন, খেলা-অভিনয় দেখতেন। পরে সূফীদের খানকায় রাত কাটাতেন এবং সামা

[92] ফুয়াদ সিযকিন, তারিখুল তুরাস আল আরাবী (সৌদি আরব, রিয়াদ, আল-ইমাম বিশ্ববিদ্যালয় ১ম সংস্করণ ১৯৮৩), প্রথম খন্ড, ২য় অংশ, ৬৫-৮৬ পৃ।
[93] ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত ১/২১১-২১২, ৩/৪৪৯-৪৫০; ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।
[94] ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।

www.assunnahtrust.com

সঙ্গীতের আয়োজন করতেন। ফজরের নামাজের পরে শিকারে বের হতেন। যোহরের পূর্বে ফিরে আসতেন।

এভাবেই চলত ঈদে মীলাদুন্নবীর রাত পর্যন্ত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মতারিখ নিয়ে মতবিরোধ থাকার কারণে তিনি একবছর ৮ই রবিউল আউয়াল, অন্য বছর ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতেন। এই দিনে ২দিন আগেই অগণিত উট, গুরু ও ছাগল-ভেড়া মাঠে পাঠিয়ে দিতেন। তবলা বাজিয়ে, গান গেয়ে, আনন্দ উৎফুল্লাতর মাধ্যমে এ সকল জীব জানোয়ারকে মাঠে পৌছান হত। সেখানে এগুলিকে জবাই করে রান্নর আয়োজন করা হতো।

মীলাদের রাত্রে মাগরীবের নামাজের পরে সামা গান বাজনার আয়োজন করা হতো। এরপর পুরো এলাকা আলোকসজ্জার অগণিত মোমবাতিতে ভরে যেত। মীলাদের দিন সকালে তিনি তাঁর দুর্গ থেকে বিপুল পরিমাণ হাদিয় তোহফা এনে সূফীদের খানকায় রাখতেন। সেখানে রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সমাজের সাধারণ অনেক মানুষ সমবেত হতেন। ওয়ায়েজগণের জন্য মঞ্চ তৈরী করা হতো। একদিকে সমবেত মানুষদের জন্য ওয়াজ নসীহত চলত। অপরদিকে বিশাল প্রান্তরে তার সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করতে থাকত।কূকুবূরী দুর্গে বসে একবার ওয়ায়েজদের দেখতেন, একবার সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখতেন। এ সময়ে তিনি সমবেত সকল আলেম, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মেহমানকে একে একে ডাকতেন এবং তাদেরকে মূল্যবান হাদিয়া তোহফা প্রদান করতেন। এরপর ময়দানে সাধারণ মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হতো, যেখানে বিভিন্ন রকমের খাদ্যের আয়োজন থাকত। খানকার মধ্যেও পৃথকভাবে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হতো।

এভাবে আসর পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলত। রাতে তিনি সেখানেই থাকতেন। সকাল পর্যন্ত সামা গানবাজনার অনুষ্ঠান চলত। প্রতি বৎসর তিনি এভাবে মীলাদ পালন করতেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন সবাই বাড়ীর পথে যাত্রা করতেন তিনি প্রত্যেককে পথখরচা প্রদান করতেন।[৯৫]

আরেকজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইউসূফ বিন কাযউগলী সিবত ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৬৫৪হি: ১২৫৬খ্রী:) লিখছেন: "তিনি ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত সূফীদের জন্য "সামা" (ভক্তিমূলক গান) এর আয়োজন করতেন এবং নিজে সূফীদের সাথে (সামা শুনে) নাচতেন।"[৯৬] তিনি আরো লিখেছেন: "কুকবূরীর ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত দাওয়াতে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের একজন বলেন: তার দস্তরখানে থাকত পাঁচশত আস্ত দুম্বার রোস্ট, দশ হাজার মুরগী, একলক্ষ খাবারের পাত্র, ত্রিশহাজার মিষ্টির খাঞ্চা। তাঁর দাওয়াতে উপস্থিত হতেন সমাজের গণ্যমান্য আলেমগণ এবং সূফীগণ, তিনি তাঁদেরকে মুক্তহস্তে হাদিয়া ও উপঢৌকন প্রদান করতেন। তিনি ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত সূফীদের জন্য "সামা" (ভক্তিমূলক গান) এর আয়োজন করতেন এবং নিজে সূফীদের সাথে (সামা শুনে) নাচতেন।"[৯৭] অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন: "তাঁর খানার মাজলিসে আমি একশত ভুনা ঘোড়া, পাঁচশত ভেড়া, দশহাজাজ মুরগী, একলক্ষ খাবারের পাত্র ও ত্রিশহাজার মিষ্টির খাঞ্চা গুনেছি।"[৯৮]

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, এই যুগ ছিল মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যুগ। আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি ও বহির্শত্রুর আক্রমনে বিপর্যস্ত মুসলিম জনপদগুলিতে কূকুবূরীর মীলাদ উৎসব অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেত। বিপর্যস্ত ও মানসিক ভাবে উৎকণ্ঠিত বিভিন্ন মুসলিম দেশের মানুষেরা এই অনষ্ঠানের মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পান। ফলে দ্রুত তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা উপসংহারে এ বিষয়ে আলোচনা করব। তার আগে আসুন ১ম ও ২য় পর্যায়ের মীলাদুন্নবী উদযাপনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে সে যুগের মীলাদ উৎসবের মৌলিক দিকগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

ঙ) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: ২ পর্যায়ের তুলনা:

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, কায়রোর ফাতেমী ইসমাঈলী শিয়া শাসকগণ যখন সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু করেন তখন তাদের অনুষ্ঠান ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বা প্রটোকলের অংশ। এ অনুষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় কায়দায় পালন করা হতো। অনুষ্ঠানের মূল দিকগুলি ছিল:

১) অনুষ্ঠান ছিল বাৎসরিক, প্রতি বৎসর ১২ ই রবিউল আউয়াল এই অনুষ্ঠান করা হতো।
২) অনুষ্ঠান ছিল শুধমাত্র এক দিনের। দিনের কিছু অংশে এই অনুষ্ঠান পালন করা হতো।
৩) অনুষ্ঠান একান্তভাবেই কায়রোর মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
৪) রাষ্টের গণ্যমান্য, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও ইচ্ছুক সাধারণ নাগরিক সমবেত হয়ে খলীফাকে এ উপলক্ষে সালাম প্রদান করতেন
৫) কুরআন তিলাওয়াত করা হতো।
৬) রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদেরকে বিশেষ সম্মান ও উপঢৌকন প্রদান।
৭) বতৃতা প্রদান। বিভিন্ন মসজিদের খতিব, রাষ্ট্রীয় কর্মকতাগণ, প্রচারকগণ এ উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করতেন।
৮) মুক্ত হস্তে দান করা। এ উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের মধ্যে মুক্ত হস্তে মিষ্টি, খাবার, অর্থ ও পোষাক পরিচ্ছদ বিতরণ করা হতো।[৯৯]

প্রত্যক্ষদশী ঐতিহাসিদদের বর্ণনা আলোকে কূকুবূরীর মীলাদ অনুষ্ঠানের বিবরণ আগেই লিখেছি। উক্ত বিবরণের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে,কূকুবূরীর মীলাদ অনুষ্ঠানের মূল দিকগুলি নিম্নরূপ:

১) অনুষ্ঠান ছিল বাৎসরিক, কিন্তু সব বৎসর একই দিনে পালন করা হতো না। কোন বছর ৮ তারিখে কোন বছর ১২ তারিখে অনুষ্ঠান করা হতো।

---

[95] ইবনে খাল্লিকান ৪/১১৭-১১৯, যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৬।
[96] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/৫৩৬। আস-সালেহী,আস-সীরাতুশ শামিয়্যা, প্রাগুক্ত ১/৩৬২।
[97] ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/৫৩৬। আস-সালেহী আস-সীরাতুশ শামিয়্যা, প্রাগুক্ত ১/৩৬২।
[98] যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৭।
[99] আল-মাকরীযী, আল-মাওয়ায়িজ ৪৩২-৪৩৩, আল-কালকাশিন্দী, সুবহুল আ'শা ৩/৪৯৮-৪৯৯।

www.assunnahtrust.com

২) মূল অনুষ্ঠানের আগে প্রায় দেড় মাস উৎসব পালন করা হতো।
৩) অনুষ্ঠানটি গণ উৎসবের রূপ গ্রহণ করে। শুধু ইরবিলের জনগণই নয়, পার্শবর্তী সকল মুসলিম জনপদের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করত।
৪) খোলা প্রান্তরে গণ জমায়েত ও গণ উৎসবের আয়োজন করা হতো।
৫) উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল খেলাধুলা, গান, ইত্যাদি আনন্দ উৎসব
৬) মীলাদ উদযাপনের মূল কর্মই ছিল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা।
৭) হাদিয়া তোহফা বিতরণ। মীলাদের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো হাদীয়া তোহফা বিতরণ করা।
৮) ওয়াজ নসিহতের আয়োজন।
৯) সেনা বাহিনীর কুচকাওয়াজ
১০) সামা ভক্তিমূলক গানবাজনার আয়োজন। মূল মীলাদ অনুষ্ঠান ৭ বা ১১ই রবিউল আউয়াল দিবাগত রাতের শুরুতে সামা সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু করা হত। আর পরদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরে ৮ বা ১১ ই রবিউল আউয়াল দিবাগত রাতে সারারাত এ ধরণের সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটত। সাধারণত: এ সকল সঙ্গীতানুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ভাবাবেগে আপ্লুত শ্রোতার গানের তালে তালে নাচতেন। একে ওজদ বলা হতো।

উভয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের তুলনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান মূলত: ছিল কিছু ধর্মীয় কাজ ও কিছু আনন্দ উৎসব ধরণের কাজের সমষ্টি: একদিকে এতে কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসিহত , অর্থদান ও উপহার বিতরণ করা হতো। অপর দিকে মিষ্টি খাওয়া, ঘরবাড়ী সাজান, খেলাধুলা ইত্যাদি উৎসব মূলক কর্মের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা হতো। খাওয়াদাওয়া ও হাদীয়া বিতরণ সকল পর্যায়ে এই উৎসবের মূল বিষয় ছিল। কূকুবূরীর অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সামা সঙ্গীতানুষ্ঠান, যা ৪র্থ ও ৫ম শতকের মিশরীয় শিয়াদের মীলাদ অনুষ্ঠানে অপরিচিত ছিল। আমি ইতিপূর্বে এর প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছি।

উপসংহার:

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মিশরের ইসমাঈলীয় শাসকগণ দ্বারা প্রবর্তিত হলেও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনকে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে অন্যতম উৎসবে পরিণত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ইবরিলের শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরীর। তাঁকেই আমরা মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রবর্তক বলে মনে করতে পারি। এর অন্যতম প্রমান হলো ৪র্থ হিজরী শতকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হলে তার কোন প্রভাব বাইরের মুসলিম সমাজগুলোতে পড়ে নি। এমনকি পরবতী ২০০ বৎসরের মধ্যেও আমরা মুসলিম বিশ্বের অন্য কোথাও এই উৎসব পালন করতে দেখতে পাই না। অথচ ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে কুকবূরী ইরবিলে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন শুরু করলে তা তৎকালীন মুসলিম সমাজগুলিতে সাড়া জাগায়। তাঁর অনুষ্ঠানে তার রাজ্যের বাইরের দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও মুসলমানেরা এসে যোগদান করতেন। অপরদিকে পরবর্তী ২০০ বৎসরের মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম সমাজে অনেক মানুষ ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন।

যে সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে ধর্মীয় কর্ম, আচার বা উৎসব হিসাবে প্রচলিত, পরিচিত বা আচরিত ছিল না, পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কর্ম হিসাবে প্রচলিত হয়েছে সে সকল কর্মের বিষয়ে সর্বদায় মুসলিম উম্মাহর আলেম ও পণ্ডিতগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন। অনেক আলেম ধর্মীয় কর্ম ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে করেন। তাঁরা ইসলামী সমাজের ধর্মকর্ম ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি অবিকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও তাঁর সাহাবীদের যুগের মত রাখতে চান। যে কর্ম প্রথম যুগের ধার্মিক মানুষেরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য করেন নি, এদের মতে সেকাজ কখনো পরবর্তী যুগের মুসলিমদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না। অপর দিকে অন্যশ্রেণীর আলেমগণ কেবলমাত্র প্রথম যুগে ছিল না বলেই কোন কর্ম বা অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেন না। বরং নতুন প্রচলন বা প্রচলিত কর্ম বা অনুষ্ঠানের পক্ষে যুক্তি প্রমানাদি সন্ধান করেন এবং সম্ভব হলে সমাজের প্রচলনকে মেনে নেন।

যেহেতু মিশরের শাসকগণ ও পরবর্তীকালে হযরত আবু সাঈদ কূকবুরী প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবী জাতীয় কোন অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না তাই স্বভাবত:ই এ বিষয়েও আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোন কোন আলেম ৭ম শতাব্দী থেকেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের বিরোধিতা করেছেন এই যুক্তিতে যে, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ তাঁদের প্রচণ্ডতম নবীপ্রেম সত্ত্বেও কখনো তাঁদের আনন্দ এভাবে উৎসব বা উদযাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি, কাজেই পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্যও তা শরীয়ত সঙ্গত হবে না। পরবর্তী যুগের মুসলমানদের উচিৎ প্রথম যুগের মুসলমানদের ন্যায় সার্বক্ষণিক সুন্নাত পালন, সীরাত আলোচনা, দরুদ সালাম ও হার্দিক ভালবাসার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অঘ্য জানান, অমুসলিমদের অনুকরণে জন্মদিন পালনের মাধ্যমে নয়। তাঁদের যুক্তি হলো এ সকল অনুষ্ঠানের প্রসার সাহাবীদের ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা সৃষ্টি করবে, কারণ যারা এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করবেন, তাঁদের মনে হতে থাকবে যে সাহাবীদের মত নীরব, অনানুষ্ঠানিক, সার্বক্ষণিক ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ পদ্ধতির চেয়ে তাদের পদ্ধতিটাই উত্তম। এ সকল নিষেধকারীদের মধ্যে রয়েছেন সপ্তম-অষ্টম হিজরী শতাব্দীর অন্যতম আলেম ইমাম আল্লামা তাজুদ্দীন উমর বিন আলী আল-ফাকেহানী (মৃত্যু: ৭৩৪ হিজরী/ ১৩৩৪খ্রী:), আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ বিন মুহম্মদ ইবনুল হাজ্জ (৭৩৭হি:/১৩৩৬খ্রী:), ৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন মূসা বিন মুহাম্মাদ আশ-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি:) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

অপর দিকে অনেক আলেম প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী বা নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের)

www.assunnahtrust.com

জন্মদিনের ঈদ পালনকে জায়েয বলেছেন, এই যুক্তিতে যে, এই উপলক্ষে যে সকল কর্ম করা হয় তা যদি শরীয়ত সঙ্গত ও ভাল কাজ হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কাজেই কুরআন তিলাওয়া, ওয়াজ নসিহত, দান-খয়রাত, খানাপিনা, উপহার উপঢৌকন বিতরণ ও নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে বাৎসরিক ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করলে তা এদের মতে নাজায়েয বা শরীয়ত বিরোধী হবে না। বরং এসকল কাজ কেউ করলে তিনি তাঁর নিয়েত, ভক্তি ও ভালবাসা অনুসারে সাওয়াব পাবেন। এ সকল আলেমদের মধ্যে রয়েছেন: সপ্তম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল আল-মাকদিসী আল-দিমাশকী হাফিজ আবু শামা (৬৬৫হি:), ৯ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হি:), আবুল খাইর মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ, শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২হি:/১৪৯৭খ্রী:), নবম ও দশম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত আলেম আল্লামা জালালুদ্দীন বিন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী (মৃ: ৯১১হি:) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।[১০০]

তবে আলেমদে মতবিরোধের বাইরে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এই অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা আগেই বলেছি যে, জন্মদিন পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও অনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। রবিউল আউয়াল মাস যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মাস, তেমনি তাঁর ইন্তেকালের মাস। বরং তাঁর জন্মের মাস সম্পর্কে হাদীস শরীফে কোন বর্ণনা আসেনি এবং এবিষয়ে কেউ কেউ মতবিরোধ করেছেন বলে আমরা জেনেছি। কিন্তু রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার তাঁর ইন্তেকাল হওয়ার বিষয়ে কারো কোন মতভেদ নেই[১০১]। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, ৭ম হিজরী শতকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুদিন পালন করা হতো, বা "ওরস" পালন করা হতো, জন্মদিন পালন করা হতো না। ভারতের প্রখ্যাত সূফী হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩১-৭২৫হি:/১২৩৪-১৩২৫খ্রী:) লিখেছেন যে, তাঁর মুরশিদ হযরত ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর (র:) (৬০৯-৬৬৮হি:/১২১২-১২৭০খ্রী:) ২রা রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল দিবস হিসাবে ওরশ পালন করতেন, যদিও মুসলমানদের মধ্যে ১২ই রবিউল আউয়ালই উরসের দিন হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং মুসলমানগণ এই দিনেই উরস পালন করেন।[১০২]

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ৭ম হিজরী শতাব্দীর শেষে এবং ৮ম হিজরী শতকের প্রথমাংশেও মীলাদুন্নবী পালন অনেক দেশের মুসলমানদের কাছে অজানা ছিল, তারা জন্মদিন পালন না করে মৃত্যুদিবস পালন করতেন। কিন্তু আবু সাঈদ কুকবূরীর জন্মদিন পালন বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন ক্রমান্বয়ে সকল মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে রবিউল আউয়াল মাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মাস হিসাবেই পালিত হতে থাকে। ৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবনে বাতুতা: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৭০৩-৭৭৯হি:/১৩০৪-১৩৭৭খ্রী:) দীর্ঘ ২৭ বৎসর ধরে সমস্ত মুসলিম বিশ্ব ও বেশ কিছু অসুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। প্রায় নয় বৎসর (৭৩৪-৭৪১হি:/১৩৩৩-১৩৪১খ্রী:) তিনি ভারতে ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সামাজিক উৎসবাদি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পর্ব ও কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আমরা কোন কোন মুসলিম দেশের মানুষদের মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী উদযাপনের কথা জানতে পারি, কিন্তু ভারত বা অন্য কোথাও তার ইন্তেকাল দিবস বা ওরস পালনের কথা দেখতে পাই না।[১০৩]

আমরা জানি, পরবর্তীকালে মীলাদ পালনের পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিবর্তন ঘটে, তেমনিভাবে তা বাৎসরিক অনুষ্ঠান থেকে দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। সম্ভব হলে অন্য কোন প্রবন্ধে আমরা এ সকল বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে চেষ্টা করব। আল্লাহই আমাদের সহায়ক ও তৌফিক দাতা। দোয়া করি তিনি দয়া করে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আল্লাহর মহান রাসূল, হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর উপর অগণিত সালাত ও সালাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লিম মা যাকারুয যাকিরুন ওয়া গাফালা আন যিকরিহিল গাফিলূন।

www.assunnahtrust.com

---

[100] বিস্তারিত দেখুন: আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম, আল-ই'তিসাম (সৌদী আরব, আল-খুবার, দারু ইবনে আফফান, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৫) ২/৫৪৮, আস সালেহী, আস-সীরাতুশ শামিয়্যা, প্রাগুক্ত ১/৩৬২-৩৭৪।

[101] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ইন্তেকাল করেছেন তা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কে হাদীশ শরীফে কোন বর্ণনা আসে নি, তাই সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে, কেহ বলেছেন ১লা, কেহ বলেছেন ২রা, কারো মতে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেছেন। দেখুন: খলিফা বিন খাইয়াত, তারিখ (বৈরুত, দারুল কলম, মুয়াস্সাতুর রিসালা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭) ৯৪ পৃ, ইবনে হিব্বান, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (বৈরুত, মুয়াস্সাসাতল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৭) ৪০০ পৃ, ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহ সহীহিল বুখারী বৈরুত, দারুল ফিকর) ৮/১২৯-১৩০, আস সালেহী, আস-সীরাতুশ শামিয়্যা, প্রাগুক্ত ১২/৩০৫-৩০৬।

[102] নিজামুদ্দীন আউলিয়া, রাহাতিল কুলুব (অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমদ, প্রকাশক: বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫হি:/১৯৯৪খ্রী:) ১৫০পৃ।

[103] রেহলাতু ইবনে বাতুতা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৭হি:/১৯৮৭খ্রী)।

www.assunnahtrust.com